স্মৃতিপূজাগ্রন্থমালা—চতুর্থখণ্ড

স্বদেশ-প্রেমিক রমাকান্ত রায়

(শ্রদ্ধাঞ্জলি)

সম্পাদক শ্রীহরিদাস নামানন্দ

যুগ্ম-সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য,

এম এ, কটন্ কলেজ গৌহাটী।

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৫৭ সাল

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জী এণ্ড কো লিমিটেড্

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

নৈবেদ্য

পূজনীয় পিতৃদেব ও পূজনীয়া মাতৃদেবীর
আত্মার প্রতি পবিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ
সূর্য্যমণি-ললিতা সাহিত্যভবনের
স্মৃতিপূজা-গ্রন্থমালা
শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে নিবেদিত হইল।

— —•— —

সূর্য্যমণি-ললিতা সাহিত্য-ভবনের মূলমন্ত্র।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই ত তপস্যা পরম,
প্রীত হ'লে পিতৃদেব প্রীত হন সর্ব্বদেবগণ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"
নারীগণ যথা পূজা পান, দেবতারা তথা প্রীতিভরে
করেন রমণ।

তরুণ ভারতের আদর্শ।

"সবারে দেই প্রেম, সবার করি সেবা, সবার চাই শান্তি,
সবার ভাবি মঙ্গল।"

"ভাবব মোরা সবার ভাল, বলব মোরা 'সবাই ভাল',
করব মোরা সবার ভাল, বাসব মোরা সবারে ভাল।
ভাবলে ভাল, বললে ভাল, করলে ভাল, বাসলে ভাল,
হবেই ভাল, হবেই ভাল, হবেই হবে সবার ভাল।"

"স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানব তারে, পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান, তারে ধন কেবা কয়?"

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

নিবেদন

এখন হইতে প্রায় কুড়িবৎসর পূর্ব্বে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ, ও আইন পড়িতেছিলাম, সেই সময় আসামের তদানীন্তন স্কুল-ইনস্পেক্টর আত্মীয়কল্প শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, (লণ্ডন), আই, ই, এস মহোদয় স্বর্গত রমাকান্ত রায়ের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দেন। সেই সময় হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে থাকিতাম, সঞ্জীবনী আফিস ছিল কলেজ স্কোয়ারে। সঞ্জীবনী-সম্পাদক মাননীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে সঞ্জীবনীর সকল পুরাতন ফাইল দেখার সুযোগলাভ করি। আফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রায়ই সকালের দিকে গিয়া আমার কাজ করিয়া আসিতাম। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল আজ তাহা প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থ রমাকান্তের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে। ইহা দিগ্‌দর্শনীমাত্র। রমাকান্তের জীবনীর কতিপয় বিচ্ছিন্ন উপকরণ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাঁহারা রমাকান্তের পূর্ণাঙ্গ-জীবনী রচনা করিবেন তাঁহাদিগকে আনুকূল্য করার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ইহা প্রকাশিত হইল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে কয়েকজন দেশপ্রেমিক তাঁহাদের বলিষ্ঠ দেহ ও ততোধিক বলিষ্ঠ মন লইয়া দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, তথা দেশবাসীর কুসংস্কার দূরীকরণের ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, রমাকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। তারুণ্য, দেশপ্রেম, পরাধীন নিপীড়িত মানবের জন্য

বেদনাবোধ প্রভৃতির যে বিচিত্র লীলা স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহারই এক সুন্দর ও সাবলীল বিকাশ রমাকান্তের জীবনে রহিয়াছে।

রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশাত্মবোধের গঙ্গোদকে স্নাত যে যৌবনধর্ম্ম রমাকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা সকল দেশের সকল কালের তরুণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মানব-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে তাঁহার ঋষি-ঋণ পরিশোধেরই মহৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিতেছি।

এই মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে আমারও সামান্য যোগ রহিয়াছে। মজুরের সঙ্গে নির্ম্মিত সৌধের যে সম্পর্ক আমার সঙ্গে এই নব প্রকাশিত গ্রন্থের সম্পর্কও ততটুকুই।

স্বনামধন্য দেশনায়ক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী মহোদয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে আমাদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কটন কলেজ, গৌহাটী
৮।৯।৫০ ইং

শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য
যুগ্ম সম্পাদক।

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু আজ তাহার সহস্র সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে না পারিলে যে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভব নহে, তাহাও সত্য। সুতরাং স্বদেশীযুগে যে প্রেরণায় দেশের যুবকবৃন্দ সকল সুখ-মোহ হেলায় উপেক্ষা করিয়া মহৎ দুঃখকে পরম গৌরবে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন বর্ত্তমানে তদপেক্ষা কঠিনতর দুর্ভোগকে বরণ করিতে হইবে; তাহা না হইলে শৃঙ্খলমুক্তির অপূর্ব্ব আস্বাদটুকু ক্ষণিকেই স্বপ্নবৎ মিলাইয়া যাইবে।

যে সকল দুঃখজয়ী মহাপ্রাণ আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শে দেশ তথা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন আজ আসিয়াছে পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের স্মরণ করিবার দিন; ত্যাগব্রতী সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয়দের সম্মুখে রাখিয়া দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রসর হইবার দিন। স্বর্গত রমাকান্ত রায় ছিলেন এমনই একজন স্বদেশপ্রাণ ত্যাগী পুরুষ। স্বদেশী যুগে যখন তিনি স্বীয় পদ-মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার পথে পথে স্কন্ধে বহিয়া স্বদেশী বস্ত্র ফেরি করিয়াছেন তখন তিনি কাশ্মীর রাজের খনিতত্ত্ব-বিদ্। রমাকান্ত তাঁহার জীবনের সকলক্ষেত্রেই এইরূপ স্বদেশহিত-চিন্তার প্রভূত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আজ খুব বেশী পরিচিত না হইলেও তাঁহার কর্মপ্রণালী ও চরিত্রমাধুর্য্য সকলেরই অনুকরণীয়—তাহাতে দেশের মঙ্গল; বিশৃঙ্খল যুবসমাজ আবার শৃঙ্খলা শিখিবে; দেশের ও দশের কল্যাণে পুনরায় তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিবে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ জীবনী রচনার প্রয়োজন সমধিক। প্রথমতঃ যাঁহারা বহু ত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গল বিধানে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়োজন আছে; দ্বিতীয়তঃ আছে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ। সুতরাং আলোচ্য জীবনী-সংগ্রহ খানির সম্পাদকদ্বয় আমাদের সকলেরই সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বিষয়সূচী।

স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্তরায়

রমাকান্ত রায়—জাপান প্রত্যাগত

জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ মৃত্যু—৩রা মে, ১৯০৬ খৃঃ

স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায়

প্রথম স্তবক

প্রবেশিকা

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"—ঈশা উপনিষদ।

যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মাতে ও আত্মাকে সর্ব্বভূতে অনুদর্শন করেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না। (ঈশা উপনিষদের ষষ্ঠ শ্লোক)

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথাদেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

দেহধারী জীবের যেমন দেহের কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থা সকল পরপর আসিয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিতে সেরূপ (আত্মার নাশ হয় না); এজন্য ধীর ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হন্ না। (গীতা ২।১৩)

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেরূপ দেহী আত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য নব দেহ ধারণ করে। (গীতা ২।২২)

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদযন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

এই দেহীকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারেনা, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারেনা, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। (গীতা ২।২৩)

যাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাকুসুমাঞ্জলিরূপে এই স্মৃতিপূজা গ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, তিনি উপনিষদের ঋষিগণের মন্ত্র জীবনে সাধন করিয়া এক বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক অখণ্ড পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বজীবকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন, ও সকল প্রাণীতে, সকল নর-নারীর অন্তরে সেই বিশ্বাত্মার জীবন্ত জাগ্রত সত্তা অনুভব করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি ছিলেন একাধারে স্বদেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অমরত্ব বিষয়ে যে অমরবাণী শুনাইয়াছেন, শস্ত্রের দ্বারা অচ্ছেদ্য, অগ্নির অদহনীয়, জলের দ্বারা অনার্দ্র, বায়ুর অশোষ্য আত্মা নব নব দেহ ধারণ করিয়া লোক লোকান্তরে নব নব জন্মগ্রহণ করিয়া, এই জীবনের বাল্য কৈশোর যৌবনাদি অবস্থা পার হওয়ার মত জীবন হইতে জীবনে অনায়াসে প্রবেশ ও প্রস্থান লাভ করিতেছেন, এই যে মহাতত্ত্ব বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়াছেন, রমাকান্ত রায়ের জীবনে সেই বাণী ও তত্ত্ব জীবন্ত মূর্ত্তিমন্ত হইয়াছে। দেশমাতৃকার অকৃত্রিম ভক্ত রমাকান্ত আত্মার জগতে বাস করিতেন, আত্মার অমরত্বে আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়াই সংসারের সকল ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া, দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য জড়তার উর্দ্ধে মস্তক উন্নত রাখিয়া, স্বদেশ জননীর সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অমরদেবতাদের সগোত্র এই মহামানব ভারত জননীর স্বাধীনতা অর্জ্জনে, বঙ্গজননীর দুঃখ মোচনে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোকের ঝড় প্রবাহিত হইয়াছিল, দেশবরেণ্য সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন

মানবজীবন বিধাতার কি অপূর্ব্বদান। দিনের সংখ্যা বা আয়ুর

দৈর্ঘ্য দ্বারা ইহার উৎকর্ষ বিচার হয় না। কত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর ভক্ত মহাজন বত্রিশ হইতে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ইহ-লীলা সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথচ মানব জাতি তাঁহাদের চরণে আজও ভক্তিপ্রণত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তেত্রিশ বৎসরব্যাপী রমাকান্তজীবন সম্বন্ধেও দার্শনিক ভক্ত রবীন্দ্র নাথের ভাষায় বলিতে পারা যায়,—

"সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

সসীম মর্ত্ত্যদেহবীণার প্রতি তন্ত্রীতে অসীমের ঝঙ্কার অনুভব করিলে পরমাত্মার প্রকাশে মানুষের ক্ষুদ্রজীবনও কত মধুর হইতে পারে রমাকান্তের স্বল্লায়ু ঐহিক লীলার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র গ্রামে—শ্রীহট্ট জিলার জলসুকা গ্রামে—সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারে যাহার জন্ম হইয়াছিল, তিনি সেই অন্তর-যামী অসীম দেবতারই প্রেরণায় সুদূর জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে খনির মধ্যে মণির সন্ধানরূপ তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। যে কাশ্মীর 'ভূস্বর্গ'নামে পরিচিত সেখানে মহারাজার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইলেও তিনি বঙ্গজননীর সেবার আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ধনসম্মান ও উচ্চপদগৌরব তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিলেন। জাপান-প্রত্যাগত ও মহারাজ কাশ্মীরাধিপতির উচ্চতম খনিতত্ত্ববিদ্ ইঞ্জিনীয়ার রমাকান্ত রায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তরুণ বাঙ্গালীদের নেতারূপে "মায়ের দেওয়া মোটাকাপড়" এর বোঝা মাথায় তুলিয়া, কলিকাতা মহানগরীর ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ফেরিওয়ালার বেশে, ঘুরিয়াছিলেন, এই দৃশ্যের মধ্যে কি সেই অসীম জীবন-দেবতারই লীলা অভিনয় দেখিতে পাইনা?

স্বদেশপ্রেম যাহার জীবনের প্রধান প্রেরণা ও অনুপ্রাণনা ছিল, তাঁহার হৃদয় বাল্যকালেই পল্লীজীবনেই মানব-প্রীতির উৎস হইবে, দীনদুঃখী রোগী শোকীদের প্রতি করুণাধারায় ও সহমর্মিতার কোমল-রসে সিক্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কলেজের ছাত্রাবস্থায় গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে আসিয়া তিনি যে গরীব পল্লীভাইবোনদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতেন ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হইলেন, তাহার মূলেও সেই অসীম মঙ্গলময় করুণাময় ভগবানেরই যন্ত্রবাদনা।

জাপান-প্রবাসী রমাকান্ত স্বদেশবৎসল ত্যাগধর্মী জাপানীদের গৃহে পরিবারে, শিক্ষামন্দিরে ও সমাজব্যবস্থায় যাহা কিছু মহৎ ও উৎকৃষ্ট তাহাই আহরণ ও অনুসরণ করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সেখানকার শিশুদের সঙ্গে, মাতৃজাতীয়াদের সঙ্গে, খনির শ্রমিকদের সঙ্গে এমন এক মধুর প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করিলেন যে তাহারা সকলেই "রায় সন" কে (জাপানী ভাষায় "রায় মহাশয়"কে) আপনার জন বা আত্মীয় স্থানীয় বলিয়া মনে করিত। তিনি সেখানকার খনির শ্রমিকদের পরিবারকে রোগ ও বার্দ্ধক্যজনিত অর্থাভাবের চিন্তা হইতে মুক্ত করিবার জন্য মুটেমজুরদের সমবায়-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সাহায্যার্থ জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট, বৌদ্ধ বিহারের পুরোহিত ও ধর্মসংঘের নিকট, শিক্ষিত নাগরিক পুরুষ ও মহিলাদের নিকট ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, তাহার ফলে প্রায় পচিশ-হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইল। আবার রুশ জাপানযুদ্ধে নিহত ও আহত সৈনিকগণের দুঃস্থ পরিবারের নারী ও শিশুদের সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বহু সহস্রটাকা তুলিয়া জাপানের

আর্ত্তগণের সেবায় বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন।. মহামানবিকতার সুরে যাঁহার হৃদয়-বীণার তার গুলি বাঁধা ছিল তাঁহার পক্ষে স্বদেশ ও বিদেশের আত্মপর ভেদজ্ঞান অসম্ভব। জাপান-প্রবাসী রমাকান্তের পত্রাবলী (সঞ্জীবনী ও প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত) তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষনা ও বিদেশীবিজাতীয়দের প্রতি সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহীতার জ্বলন্ত প্রমাণ দেয়। স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের অপূর্ব সম্মিলনের এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় কলিকাতায় সঞ্জীবনী-সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ভারতী-সম্পাদিকা ৺সরলাদেবী প্রভৃতি মান্যগণ্য নেতা ও নেত্রীগণের নিকট প্রীতিপূর্ণ সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিলেন। শ্রীহট্টীয় ছাত্রগণ জাপান হইতে. নবাগত এই স্বদেশী বীরকে বিপুল উৎসাহে অভিনন্দিত করিলেন এলবার্ট হলের এক মহতীসভায়,— যেখানে পৌরাহিত্য করিয়াছিলেন স্বনামধন্য দেশভক্ত ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও মহাত্মা (তখন মিঃ) মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীমহোদয়। এত অল্পবয়সে (রমাকান্তের বয়স তখন মাত্র ত্রিশবৎসর) এরূপ সম্মানিত হইবার সৌভাগ্য খুব কমসংখ্যক ভারতীয়ই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সম্মান যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছিল। রমাকান্তের জাপান হইতে ফিরিবার পর মাত্র আড়াই বৎসরের কর্ম্মজীবনে এই মানপত্রের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে বাঙ্গালী সমাজে শিক্ষিত যুবকগণকে কেরাণীগিরি ও সরকারী চাকুরীর যে মোহ মায়াপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, রমাকান্তের প্রভাবে ও উৎসাহে সেই মোহের বন্ধন ছিন্ন হইতে লাগিল। শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষা-ভাণ্ডার পুষ্টিকল্পে তাঁহার

প্রস্তাবিত "আনাকণ্ড" ও "চারিআনাকণ্ড" অপ্রত্যাশিত উদ্দীপনার সঞ্চার করিল, অল্পদিনের মধ্যেই শ্রদ্ধেয় দেশহিতৈষী যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে "শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষা"-অগ্রসারিণী সমিতি (Association for the Advancement of Scientific and Technical Education) স্থাপিত হওয়ায় বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক দলে দলে আমেরিকায়, ইয়ুরোপে ও জাপানে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইতে লাগিলেন। বঙ্গ-বিভাগজনিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় রমাকান্তের নেতৃত্বে শত শত তরুণ বাঙ্গালী স্বদেশপ্রেমে মায়ের সেবায় আত্ম-বলিদান করিতে লাগিলেন। ৺শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ৺ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উদীয়মান তরুণ ছাত্রনেতারা গবর্ণমেণ্টের ছাত্রদমননীতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসাইটী স্থাপন করিলেন, ছাত্রসমাজ ভবিষ্যতে সরকারী চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ জননীর সেবার প্রেরণায় ভীষণ রাজনৈতিক সংগ্রাম-সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আর তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন নির্ভীক শিখ পালোয়ান্ সদৃশ "শালপ্রাংশু মহাভুজ" রমাকান্ত, যিনি কাশ্মীরের নন্দনকানন উপেক্ষা করিয়া বঙ্গজননীর চোখের জল মুছাইবার জন্য রাণীগঞ্জের ও ঝরিয়ার কয়লার খনিতে সামান্য বেতনে চাকুরী স্বীকার করিলেন। লৌহভীমের মত সবল দেহ প্রচণ্ড সংগ্রামের অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া শিথিল গ্রন্থি-বন্ধনের ফলে সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া মানসিক বিকারে "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যমদূতকে আলিঙ্গন করিল। মধ্যাহ্ন গগনেই রমাকান্তের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইল, সীমার সঙ্গে অসীমের চিরমিলনে মানবলীলার রঙ্গমঞ্চে অকালে যবনিকাপাত হইল। মর্ত্ত্যদেহধারী রমাকান্ত ১৮৭৩ ইং সনে যে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯০৮

ইং সনের ৩রা যে সেই সংসার হইতে বিদায় লইয়া অমর লোকে প্রয়াণ করিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালী জাতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে যে বীরত্বের, সৎসাহসের ও আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন আজও তাহা স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে। বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাপারে কার্জ্জনী শাসননীতির বিরুদ্ধে কঠোর তপস্যামূলক প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া জয়লাভ করিতে না পারিলে আজ ভারতের স্বাধীনতা যে এত সহজে ও সত্বর আমাদের আয়ত্ত হইত না তাহা নির্ব্বিবাদে সকলকে মানিতে হইবে। স্বদেশভক্ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জাতিগঠনমূলক আত্মজীবনীতে (A Nation in tho Making) লিখিয়াছেন যে আসামের তদানীন্তন লাট ফুলার সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য কয়েক জন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে এই পথ হইতে নিবৃত্ত করেন। নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু ভারতীয় জাতীয় সেনাদল গঠন করিয়া যে স্বাধীনতাযজ্ঞের শেষ আহুতি দিলেন তার আরম্ভ হইয়াছিল ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন), যেদিন দেশপূজ্য কর্ম্মযোগী আনন্দমোহন প্রভৃতি নেতাগণ লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগকে অচল করিবার জন্য স্বদেশীমন্ত্রগ্রহণ করিলেন ও বৃটিশ রাজনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। রমাকান্ত ছিলেন সেই যুগের "জহরলাল"। রমাকান্তের নেতৃত্বে বঙ্গীয় ছাত্রসমাজ ও তরুণদল এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতা লাভে যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন; এজন্য আজ স্বাধীনভারতের যুগে আমরা ৪২ বৎসর পূর্ব্বের-স্বদেশ-প্রমিক কর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৭৪খৃঃ)

পরিশিষ্টে এই পত্রাবলীর যতদূর সম্ভব মুদ্রিত হইল। ১৩০৭ বাংলার ২৩শে ফাল্গুণ সংখ্যার "সঞ্জীবনী"তে "জাপানে শিল্পশিক্ষা ও আমাদের দুঃখের কথা" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার লেখক (জাপানপ্রবাসী রমাকান্তের সমসাময়িক বাঙ্গালী) উপসংহারে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :— "উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাবু রমাকান্ত রায় যখন জাপানে যান, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে ভারতবাসী ছাত্রদের নিকট হইতে চিঠি পত্রাদি পাইতে থাকেন। তাহাতে আশা করা গিয়াছিল অনেক ভারতবাসী ছাত্র জাপানে পড়িতে যাইবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৫।৬টি ছাত্র অধ্যয়নের জন্য জাপানে গিয়াছিলেন। জাপানে আমাদের শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা এবং ব্যয় যেমন কম, তাহাতে প্রত্যেক বৎসরেই যদি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক একটি করিয়া ছাত্র বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে যান তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদের দেশে অনেকগুলি যুবককে শিল্প-বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া আনা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সকলে না হইলেও কেহ কেহ যে দেশে ফিরিয়া আসিয়া কল-কার খানা খুলিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর কতদিনে আমাদের দেশের লোক এইসব সদনুষ্ঠানের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিবেন ও দরিদ্রতা-রাক্ষসের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবেন?"

তার পরবর্ত্তী সংখ্যার সঞ্জীবনীতে (১৩০৭ বাং ১লা চৈত্র) যে ছয়জন ভারতবাসী ছাত্র তখন জাপান-প্রবাসী ছিলেন তাহাদের ফটো (চিত্র) প্রকাশিত হয়—পুরাণ সিং, কুলকর্নী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় দামোদর সিং, রমাকান্ত রায় ও শালগ্রাম সিং। ইহাদের মধ্যে সর্দ্দার পুরাণ সিং (পাঞ্জাবী শিখ) রমাকান্তের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

তিনি পরে দেরাদুনে আরণ্যক বিদ্যায়তনে (Forest College) ইম্পিরীয়ল ফরেষ্ট কেমিষ্ট (নিখিল ভারতীয় সাম্রাজ্যের জঙ্গল রাসায়নিক) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রমাকান্তের মৃত্যুর পরও শ্রীযুক্ত পুরাণসিং জীর পরিবারের সঙ্গে রমাকান্তের আত্মীয়দের যোগ অটুট ছিল। তিনি "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" পত্রিকায় রমাকান্তের জাপান-প্রবাস কালীন জীবন বিষয়ে যে স্মৃতিপূজা ও শোকপ্রকাশমূলক প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে তাঁহার নানামুখী কর্ম্মপ্রতিভা ও সদ্‌গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জাপানে রমাকান্তের জনপ্রিয়তা বিষয়ে এই প্রবন্ধটী উপাদেয়; "জাপানে ভারতবাসী ছাত্রদের অবস্থা" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে (১৩০৮ বাংলার সঞ্জীবনী পত্রিকার ১৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) রমাকান্তের নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার বিষয়ে আভাস দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :—

"শিক্ষার্থী ভারতীয় যুবকেরা জাপানে কি ভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, ইহা জানিবার জন্য আমাদের স্বদেশী যুবকবন্ধুদের আগ্রহ হইতে পারে। আর বিশেষতঃ যে যুবকেরা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মভূমি হইতে ৭।৮ হাজার মাইল দূরে এই প্রবাসে আসিয়াছেন, উঁহারা কেমন আছেন, উহা স্বদেশবাসী বন্ধুদের জানা উচিত মনে করি।

আমার প্রথম কথা, উঁহাদের নৈতিক জীবন। একথা আনন্দের সহিত বলা যাইতে পারে, এখানে ভারতবাসী যুবকগণ একমাত্র চরিত্রপ্রভাব দ্বারাই জনসাধারণের অনুরাগভাজন হইয়াছেন। উঁহাদের ভদ্র, বিনীত শান্ত ব্যবহারে জাপানীরা ভারতবাসীদের ভালবাসিতে শিখিয়াছে। জাপানের অনেক খ্যাতনামা সুসন্তানেরাও ভারতবাসী ছাত্রদের সহিত বন্ধুতা করিতে আগ্রহান্বিত। উহা ভারতবাসী নবযুবক সম্প্রদায়ের কত আশা, উৎসাহ ও সুখের

সদাচার। ভারতবাসী শিক্ষার্থী যুবকেরা কি দুর্নীতির ক্রীতদাস হইয়া এই উচ্চস্থান হারাইবেন? তাঁহারা কি অমিতাচারী, নীতিজ্ঞান-বিহীন হইয়া মহামুনি শাক্যমুনির জন্মস্থান ও লীলাভূমি ভারতের অবমাননা করিবেন? চরিত্র ও শিষ্টাচার এই যুবকদের দ্বারা পালিত হইতেছে। এই দুই উচ্চনীতির জন্য শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় ও কে, ডি, কুলকারনির নিকট বর্ত্তমান ভারতবাসী বিশেষ ভাবে ঋণী।"
উক্ত লেখক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন এইবলিয়া—
"আজকাল এখানে একটি বাঙ্গালী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন আর সব পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবী ভাইয়েরা কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য দেশ-প্রসিদ্ধ কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙ্গালীরাও কষ্টসহিষ্ণুতায় পাঞ্জাবী ভাইদের পার্শ্বেই স্থান পাইবার উপযুক্ত। বাবু রমাকান্ত রায় আরও দুইটী একটি বাঙ্গালীযুবক জাপানে আসিয়া উহার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।"

১৯০৩ ইংসনের অক্টোবর মাসে রমাকান্ত জাপান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বেঙ্গলী পত্রিকায় ৯ই অক্টোবর (১৯০৩) তারিখের সংখ্যায় "মিঃ রমাকান্ত রায়ের জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন" শীর্ষক (সম্পাদকীয়) নিবন্ধে তাঁহাকে অভিনন্দিত করাহয়। তারপর তিনি নিজগ্রামে যাইবার পথে ১৯০৪ ইংসনের জানুয়ারীমাসে শ্রীহট্ট আগমন করেন। "সাপ্তাহিক ক্রনিকেল" পত্রিকায় (১৯।১।০৪ তারিখে) ইহার উল্লেখ আছে। এই উপলক্ষে "পরিদর্শক" পত্রিকায় যে অভিনন্দনসভার বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৯০৪ ইং সনের এই অভ্যর্থনার পর তিনি মাত্র দুইবৎসর কর্ম্মজীবনে অতিবাহিত করেন। কাশ্মীরে ও রাণীগঞ্জে খনিবিজ্ঞান কার্য্যকরীতায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহা উত্তর কালে ভারতের খনিজসম্পদ বৃদ্ধি করায় সহায়

হইতে পারিত, কিন্তু বিধাতার মঙ্গল-ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই এ সকল-কাজের চেয়ে বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে ও স্বদেশী শিল্পোদ্ধার প্রচেষ্টায় তিনি বেশী মনোযোগী হন। এই নূতনযুগের তরুণ দলের স্বাভাবিক নেতারূপে তিনি স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশ-সেবার যে নির্ম্মল আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী স্তবকগুলিতে বিবৃত হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি ধনী ছিলেন না, সরকারী উচ্চপদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, অথচ তাঁহার চরিত্র, নিঃস্বার্থত্যাগের ভাব, বিনয় ও সৌজন্য সকলকে এমন মুগ্ধ করিত যে তিনি সহজেই তখনকার বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ যুবজনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমানুরাগ, শ্রদ্ধাপূর্ণ বাধ্যতা ও ভক্তি-কৃতজ্ঞতারঞ্জিত আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

১৯০৬ ইংসনের ৩রা মে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইল, কিন্তু তাঁহার পুণ্য জীবনের সৌরভ পত্রিকা-সহযোগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিশেষতঃ সঞ্জীবনীপত্রিকা, প্রবাসীপত্রিকা ও মুকুলপত্রিকায় তাঁহার জীবনের যে সুন্দর আলেখ্য পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহার অবলম্বনেই প্রধানতঃ এই স্মৃতিপূজার মালা রচিত হইল। দুঃখের বিষয় চল্লিশবৎসরের অধিক হইল তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীপ্রকাশের জন্য প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টা বিফল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া এই স্মৃতিপূজার স্তবকগুলিই একত্রে সজ্জিত করিয়া পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে হইল। সর্ব্বাগ্রে পূজনীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের নিকট ও 'মুকুল' সম্পাদক ও সম্পাদিকার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। মাতৃতুল্যা শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী মহাশয়া, শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় ললিত মোহন দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ন চৌধুরী (যিনি ছাত্রজীবনে undergrad-

১৯১০ সনে জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্তের অভিনন্দন সভার আয়োজনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন ও মানপত্রের খসড়া রচনা করেন), স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন রায় ও স্বর্গীয় রাধা চরণ দাস মহাশয় নানাদিক হইতে এই স্মৃতিপূজার পুষ্পমালা গ্রন্থনে মূল্যবান উপাদান পাঠাইয়া আমাদিগকে সাহয্য করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কল্যাণীয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক রাধামোহন দাসের মত সহৃদয় অনুরাগীদের সহযোগীতা না পাইলে এই গ্রন্থের উপকরণ গুলি সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইত কিনা সন্দেহ, এজন্য তাহাদিগকে আমাদের স্নেহাশীষপূর্ণ অভিনন্দন জানাইতেছি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, তাঁহার রাঁচীস্থিত মোরাদাবাদ পাহাড়ের ভবন "শ্রীনিবাস" হইতে ১০।১১।৪২ ইং সনে লিখিয়াছিলেন :—

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

"রমাকান্তরায়ের জীবনী বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আমার মনেআছে সেইদিনের কথা যেদিন আমরা—শ্রীহট্টের স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহার জাপানযাত্রার কথা শুনিয়াছিলাম ও আমাদের মধ্যে কিরূপ উত্তেজনা হইয়াছিল। তিনি যখন জাপান হইতে ফিরিয়া আসেন তখন আমি কলিকাতায় ছিলাম ও এখনও আমার মনে আছে আমরা শ্রীহট্টীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলাম তার প্রথম লাইনগুলি, আর এইসম্পর্কে মহাত্মাসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ও মনে আছে। আমার বিশ্বাস পাইলগাঁও এর ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীমহাশয় ঐ অভিনন্দনটির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাসায় (বোধহয় রমানাথ মিস্ত্রীর লেনে) প্রায়ই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম।

ও আমার ইয়ুরোপ যাত্রাবিষয়ে তাঁহার উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম। তিনিই সঙ্গীতসহ স্বদেশী শোভাযাত্রা (প্রসেসন) প্রথম আরম্ভ করেন—যাহাতে আমরা ছাত্রগণ যোগদান করিতাম। আসাম ব্যবস্থাপকপরিষদের সভাপতি বসন্তবাবু এবিষয়ে অনেক স্মৃতি-কথা বলিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর আগে ভারতীয় খনিতত্ত্ব বিদ্যালয়ের সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ সিডলমিন রমাকান্তরায় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা আমার কাছে আছে।" প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসমহাশয়ও এরূপ অনেক উপকরণ দ্বারা আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। এই দুইজনকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করি। রমাকান্তকে যাহারা সাক্ষাৎভাবে জানিতেন ও ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব সূত্রে মিশিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন তাঁহাদের নিজের ভাষায়ই পরবর্তী স্তবকগুলি মুদ্রিত হইল। এজন্য কোন কোন স্থলে কয়েকটি বিষয় বা ঘটনার পুনরুক্তি হইলেও অবান্তর বা অপ্রীতিকর হইবেনা, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

রমাকান্তের গ্রাম ও পরিবার, ছাত্রজীবন ও ধর্মজীবন বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। শেষ দুইটি স্তবকে এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমায় বানিয়াচুঙ্গ ও আজমিরীগঞ্জের মধ্যে অবস্থিত রমাকান্তের জন্মভূমি এই গ্রামটি জলশুকা, জলসুকা, জলসুখা, জালশুকা প্রভৃতি নামে উচ্চারিত ও লিখিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে, সিক্কার (টাকার) উপর জলমহালের বন্দোবস্ত হইত, এজন্য "জলসিক্কা" হইতে জলসুকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বানিয়াচঙ্গ গ্রামের ব্রাহ্মবংশের আদিপুরুষ কেশবমিশ্রের আগমন বিষয়ে একটি সারিগানে মিশ্রঠাকুর বানিয়াচঙ্গে পৌছিবার পূর্ব্বে জলসুকা ও পশ্চিমভাগ এই

হুই গ্রাম পার হইয়া যান বলিয়া উল্লেখ আছে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি-হিসাবে নদীর তীরবর্ত্তী উচ্চতরভূমিতেই প্রথম বসতি পাওয়া স্বাভাবিক। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে জলসুকার প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমেয়। জল শুকাইয়া যাওয়ার পর গ্রামের পত্তন হইয়াছে বলিয়া জলশুকা নাম হওয়া স্বাভাবিক। আবার ধীবরেরা প্রাচীনকালে এইগ্রামের নদীতীরে বাস করিত ও মাছ ধরিবার জাল শুকাইত বলিয়া গ্রামের নাম জালশুকা হইয়াছে এই কিংবদন্তীও অবিশ্বাসযোগ্য নয়। বর্ষার সময় গ্রামটি চারিদিকে বিশাল জলরাশির প্রবাহে বেষ্টিত হইয়া দ্বীপের মত সুন্দর দেখায় ও এখানে জল সুগম, স্বাদু ও প্রশস্ত বলিয়া প্রচুর জলের সুখ থাকাতে ইহার নাম 'জলসুখা' রাখা হইয়াছিল, ইহাও দাবী করা হয়। মোটের উপর জলসুখা, জলশুকা ও জালশুকা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কোনটিই উপেক্ষার বস্তু নয়। স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায় বাল্যকাল হইতেই স্বগ্রামভক্ত ছিলেন, স্বগ্রামবাসীদের সেবক ছিলেন, ইহা স্বাভাবিক। তাঁহার গ্রামের ও পরিবারের (মাতৃকুল ও পিতৃকুলের) প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ বিষয়ে বাস্তবিকই গৌরব করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে ইহা এইগ্রন্থের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। এইগ্রামে "দালালিয়া' হাটীর (পাড়ার) দালালিয়া বাড়ীতে ৺সাধুরাম রায়েরপুত্র কালীকিশোর রায়ের ঔরসে ৺কৃষ্ণগোবিন্দ রায় মহাশয়ের কন্যা প্রেমময়ীর গর্ভে ১১৭৩ ইংসনে রমাকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন তিনজন (১) ৺কমলাকান্তরায় (যিনি অন্ধ হইয়াও নবদ্বীপ প্রভৃতিস্থানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরূপে ও বৈষ্ণব-ভক্তরূপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন) (২) ৺রাধাকান্ত ও (৩) লক্ষ্মীকান্ত (যিনি রমাকান্তের চেলারূপে দৈহিক শক্তি অনুশীলনে দক্ষতা

লাভ করেন); ও একজন কনিষ্ঠ ছিলেন ৺শ্রীকান্ত (যিনি রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর ও "বঙ্গগৌরব" গ্রন্থের সম্পাদকরূপে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ছিলেন)। রমাকান্তের মাতামহ জলসুকা মধ্য ইংরেজী স্কুলটি স্থাপন করেন ও এখান হইতে রমাকান্ত ১৮৯০ ইংসনে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

গ্রামের ছাত্রজীবনে রমাকান্ত একবার ক্রীকেট খেলা উপলক্ষে একটা খুনের মামলায় জড়িত হন ও আদালতে সত্যবাদিতা ও সৎসাহস দেখাইয়া মুক্তিলাভ করেন। শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িয়া তিনি ১৮৯৪ ইংসনে এণ্ট্রেন্‌স্ পাস করেন। তার পর দুই বৎসর সিটিকলেজে অধ্যয়ন করিবার পর স্বাস্থ্যের অভাবে কিছুদিন পড়াশুনা বন্ধ করেন। ১৮৯৮ সনের জুলাইমাসে তিনি পূজণীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের উৎসাহে ও যুবক জমিদার তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাপানযাত্রা করেন। ১৯০৩ ইং সনে ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খনিতত্ত্ব-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ('মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার' উপাধিলাভ করিয়া) দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে রোগীর সেবা, পরোপকারীতা, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি নানা সদ্গুণের কাহিণী বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা পরবর্ত্তী স্তবকসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। জাপানে প্রবাসকালে একটি ভারতীয় যুবককে আমেরিকা যাত্রায় সাহায্য করিবার জন্য 'কাল কি খাইব' চিন্তা না করিয়া তিনি নিজের একমাত্র সম্বল ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ধার দিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে ও যখন মাত্র আড়াই শত টাকা মাসিক বেতনে রাণীগঞ্জে কায করিতেন তখন নিজের খরচ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় চালাইয়া বাকী দুই শত টাকা মাসিক সাহায্যে চারিজন বাঙ্গালী যুবককে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য

আমেরিকায় প্রেরণ করেন। তাঁহার উদারতা ও মানবপ্রেম এরূপ অসাধারণ ছিল।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মূলে ছিল গভীর ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মভাব। যৌবনের আরম্ভে কলিকাতার ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির খোরাক সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যে বীজ হইতে চরিত্রের উৎকর্ষ, মানবপ্রেম, পবিত্রজীবনের আকাঙ্ক্ষাও ধর্মপ্রাণতা অঙ্কুরিত হয়, তাহা রমাকান্ত তাঁহার পিতৃবংশীয় ও মাতৃবংশীয় পূর্ব্বপুরুষদের নিকটই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত হরিনাম-জপমন্ত্রসাধনপরায়ণ বৈষ্ণব পরিবারেই তাঁহার ধর্মজীবনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

রমাকান্ত ধর্মভাবপরায়ণ ছিলেন তাহার পিতামাতার ও বংশপরিবারের উত্তরাধিকারে ও প্রভাবে। বিশেষতঃ তাঁহার মাতামহ পরিবারে অনেকেই ধর্ম্মের জন্য গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে পুণ্যতীর্থবাসী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মসম্মত সকল প্রকার পূজাপার্ব্বণ তাঁহারা অতি নিষ্ঠা ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন, যাত্রা ও নাট্যাভিনয় (ধর্ম্মজীবনের পোষক) সম্পন্ন করাইতেন। তাঁহাদের দেবেদ্বিজে নৃপেতীর্থে দৈবজ্ঞে বৈদ্যে ও গুরুতে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দানদক্ষিণাতে অর্থব্যয়ের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি সমগ্র জিলায় বিস্তৃত হইয়াছিল; একাদশ স্তবকে ইহার বিবরণ দেওয়া হইল। তাঁহার মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যমণিরায় ও তাঁহার পত্নী ললিতাদাসীর পুণ্য জীবনচরিত্র এই স্মৃতিপূজা-গ্রন্থমালার অঙ্গরূপে (তৃতীয় খণ্ড) পৃথক্ প্রকাশিত হইয়াছে।

যেমন ধর্ম্ম সাধনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে তেমন সাংসারিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত বিষয়েও রমাকান্তের গ্রাম ও পরিবার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুরমাউপত্যকা রাজনৈতিক সম্মিলনী উপলক্ষে তৎকালীন

নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃগণ এই গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। রমাকান্তের মাতুল ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় (আসাম ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর) ছিলেন এই সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; ৺রাখালচন্দ্র রায়, ৺পার্ব্বতীচরণ রায় প্রভৃতির নামও বিশেষ ভাবে এই সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রমাকান্তের মাতুল পরিবারের মধ্যে দুইজন বিলাতে গিয়া শিক্ষাসমাপ্ত করিয়া আসেন। একজন রমাকান্তের প্রায় সমসাময়িক—৺রাধামাধব রায় ১৮৯৯ সালে বিলাতে গিয়া কুপার্স হিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯০৪ সনে দেশে ফিরিয়া আসেন ও নিখিল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সার্ভিসে (I.S.E.) প্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের পূর্ত্ত বিভাগে (P.W.D.) সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন ও পরে "রায় শিল্পালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। আর একজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাস করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুলইনস্পেক্টর ও শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর (আসামের D.P.I.) পদে নিযুক্ত হইয়া I.E.S. (নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সেবা) হইতে অবসর-প্রাপ্ত হন। রমাকান্তের ভাই শ্রীকান্ত বিলাতে ও আমেরিকায় শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছিলেন, ভাগিনেয় ভূপেন্দ্র ও মাসতুতো ভাই মুরারি আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন ও তাঁহার গ্রামের সম্পর্কিত অন্য একটি যুবক (অধ্যাপক শশীভূষণ দাস) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, (ইংরেজীর দুই গ্রুপে) সুখ্যাতির সহিত পাশ করিয়া লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছিলেন। রমাকান্ত যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন তার ফলে ও প্রভাবে বিলাত ও আমেরিকা-ফেরতা আত্মীয়গণও ব্রাহ্মসমাজের সহিত স্বভাবতঃ যুক্ত হইলেনই, তাহা ছাড়া তাঁহার

জ্ঞাতিভাই ৺হরিমোহন দেব, ঈশানচন্দ্র রায়, ব্রজগোপাল হালদার, গোবিন্দলাল হালদার, মামাতো ভাই ৺বিধুভূষণ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। জমিদারী পরিচালনায়, সাহিত্য সেবায় ও সামাজিক-কল্যাণ সাধনে জলসুখার অনেকে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। রমাকান্তের এক মেসোমহাশয় ৺গোবিন্দচন্দ্র রায় সম্বন্ধে একটি সারি গান আছে তাহার একটি দুইটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—"ধন্য গোবিন্দচন্দ্র রায়। সোনার পুরী আঁধার করে লুকালে কোথায়। হাবী কাঁদে পরীকাঁদে' কাঁদে দুনিয়ায়। ত্রিপুরা সুন্দরী (পত্নী) কাঁদে লুটায়ে ধরায়॥"

ছাত্রজীবনে রমাকান্ত যে সব ধর্মপুস্তক পড়িতেন তাহার কয়েকখানা তাঁহার জনৈক মাতুল ছাত্রজীবনে সংগ্রহ করিয়া রায়ের গ্রন্থাগারে (Roys' Libraryতে) সযত্নে রাখিয়াছিলেন। নীচে সেই বহিগুলির নামের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতেই রমাকান্তের প্রাণের টান কোন্ দিকে ছিল বুঝা যাইবে—

(১) ঈশ্বর ও আত্মা (আর্মষ্ট্রঙ্গ সাহেবের প্রণীত-God and the Soul).

(২) একেশ্বরবাদ বা সাধারণজ্ঞান মূলক ধর্ম (ভয়সী সাহেবের লিখিত Theism or the Religion of Commonsense)

(৩) খ্রীষ্টের অনুকরণ (টমাস এ কেম্পিস সাহেবের রচিত Imitaton of Christ)

(৪) ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ (থিওডোর পার্কার প্রণীত Discourses on Matters pertaining to Religion)

(৫) ধর্মজীবন (২য় ও ৩য় খণ্ড) (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত)

(৬) ব্রাহ্মসমাজ (কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের The Brahma Sam .)

(৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপহার বা প্রার্থনাঞ্জলি (Offering)

তাহা ছাড়া জাপান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যতথ্যপূর্ণ একটি হ্যণ্ডবুকও এই সকল গ্রন্থের সঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল (A Handbook of Informations, N. Y, & Co, Japan)

রমাকান্তের জীবন স্বদেশপ্রেমে উৎসর্গিত হইয়াছিল বলিয়া মহৎ। মহৎ জীবনের মধ্যে মহামানবের বিশালতা ও গভীরতা দুইটি গুণই বিদ্যমান থাকে। তাঁহার নীরব গাম্ভীর্য্যের কথা ও সকলপ্রকার উত্তেজনা ও কোলাহলের পশ্চাতে ধীর প্রশান্তভাবে কর্ম্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য ধ্যানস্থ হইবার কথা তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মী ৺শচীন্দ্র প্রসাদবসু ও ৺ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্তবকে) সরলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার মহাসাগরের মধ্যে যেমন উপসাগর, সাগর সব একবর্ণে, এক বিশাল জলরাশির প্রবাহে মিশিয়া যায়, তেমনি রমাকান্তের নিকট শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত সকলবর্ণের, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকল জাতির, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান শিখ পার্শি সকল ধর্ম্মের, বাঙ্গালী আসামী পাঞ্জাবী মাদ্রাজী জাপানী মার্কিন ইংরেজ সকল দেশের ও সকল ভাষাভাষী নরনারী সমভাবেই সেবার অধিকারী ছিলেন। বিশ্বপ্রেম ছিল তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ণস কোম্পানির কেরানীদের ধর্ম্মঘটের সময় তিনি তাহাদের জন্য কিরূপ সহমর্ম্মিতা অনুভব করিয়াছিলেন, সুধু গোলদিঘীর পারে (কলেজস্কোয়ারে) বিরাট জনসভায় সাতটি মঞ্চ হইতে পর পর বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের অসহায় পরিবারগণের অন্নাভাব, ও বস্ত্রাভাব কষ্ট দূর করার জন্য ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া প্রাণপণে অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশী কাপড়ের প্রচার ও বিক্রয় সুগম করিবার জন্য ও বিলাতীবস্ত্র বর্জ্জন (বয়কট) প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য তিনি শুধু ফেরিওয়ালার কাজ করিয়াছিলেন তাহা নয়,

কলকারখানার মুটে মজুরদের সঙ্গে একপ্রাণতার যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ত্যাগ ও সাম্য ছিল তাঁহার স্বদেশপ্রেমের অভিনবত্ব। দেশের জন্য মৃত্যুবরণ, তিল তিল করিয়া রক্তদান রমাকান্ত ও তাঁহার সহকর্মীরা জীবনের অনন্ত অগ্নিপরিক্ষা দ্বারা বাস্তব করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষিত মজুরেরাও কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে পারে ও দেশের নেতাদের সঙ্গে একযোগে সেবা করিতে পারে তাহা রমাকান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে উত্তরকালে ডাঃ বিধানচন্দ্ররায় বরাহনগর ও বারাকপুরের কলকারখানার শ্রমিকগণের ভোট সংগ্রহ করিয়া দেশমান্য সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রধান নেতাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভাবনায় রমাকান্ত যে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল তাঁহার দেশপ্রীতি, ত্যাগ ও সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "তোমার অসীম মনপ্রাণ লয়ে যতদূরে আমি ধাই।
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই।"
আজ রমাকান্ত সেইঅসীমের মধ্যে প্রাণমন মিশাইয়া অমর দেবতাগণের সভায় তাঁহার যোগ্য আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য কোন শোক বা বিরহ বেদনা প্রকাশের অবসর কোথায়? আমরা "অন্ন লইয়া থাকি তাই" আমাদের "যাহা যায় তাহা যায়, কণাটুকু যদি হারায় তা নিয়া প্রাণ করে হায় হায়।" আমরা ভুলিয়া যাই যে সেই অসীমের মধ্যে কত কোটি শশীভানু আছে তাহারা কখনও অণুপরমাণুও হারায়না। আমাদের ক্ষুদ্র হারাধনগুলি কি তাঁরই পায়ে স্থান পায়না? রমাকান্ত জীবিত থাকিতে যে দেবচরিত্রের, মৈত্রীভাবের অনুশীলন করিয়াছিলেন তাহার পুণ্যস্মৃতি-সৌরভ এখনও মর্ত্তলোকে

বিস্তারিত হইয়া পড়িবার প্রয়োজন। তাই এই স্মৃতিপূজার দীন আয়োজন। এই স্বল্পায়ু জীবনের অমর দীপটী, এই অনিত্য সংসারে জাত সুগন্ধ নন্দন পরিজাতটি বর্ত্তমানযুগের তরুণ ভারতীয়দের প্রাণে স্বদেশপ্রেমের বিশুদ্ধ আলোক বিকীরণ ও বিমল সৌরভ বিতরণ করিতে সমর্থ হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পাথরের থালায় জল রাখিলে তাহাতে সূর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা কত স্নিগ্ধ, কত মধুর হয়। উজ্জ্বল সৌর কিরণ তখন সংহত হইয়া সূর্য্যের আকৃতিটি লোকচক্ষুর গোচর করে। মানুষের জীবনে যে অসীমের প্রকাশ তাহা এত বিরাট, এত অনন্ত, এত গভীর, এত উন্নত যে আমরা তাহা ধারণাই করিতে পারিনা। কিন্তু যুগে যুগে যেসকল মহামানব পরমেশ্বরের প্রতিনিধি রূপে অবতীর্ণ হন—বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, গুরু নানক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি—তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি ও অপ্রাকৃত লীলার মধ্যে সেই অসীমের ভাব প্রকট হইয়া পড়ে, তাই আমরা ভাগবতী সত্তার পরিচয় পাই। রমাকান্তের ক্ষুদ্র-পরিসর জীবনভূমিকায় মহাপুরুষত্বের বীজ সংহত বা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, তাহা পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জরমুক্ত হইয়া পরপারের আহবানে অনন্ত আকাশে ছুটিয়া গেল। তবু আমরা যেটুকু তাহাকে দেখিবার, জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি তার মধ্যেই অনন্তদেবতার উপহৃত হীরক অঙ্গুরীয়ের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। অসীমের সত্য, জ্ঞান, পুণ্য পবিত্রতা, মঙ্গলভাব, সৌন্দর্য্য, প্রেম, আনন্দ ও অমৃতরসের ছাপ এই স্বদেশ-প্রেমিকের মর্ত্ত্য জীবনে উজ্জ্বলরূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই সীমার উপরে যে অসীম দেবতা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের ছায়াপাত করেন, তাঁহার কোলে রমাকান্তের শান্তিপূর্ণ সরলতাপূর্ণ ও প্রসন্নতায়

ভরা হাসিমুখটি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া আমরা বন্ধুজনের সম্মুখে এই জীবন-পরিচয়টি নিবেদন করিলাম। শ্রীভগবানের চরণে এই স্মৃতিপূজার মালা অর্পিত হউক।

রমাকান্তের আত্মার স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা এই স্তবকের উপসংহার করি।

রমাকান্তের স্মৃতিতর্পণ।

যাঁহার স্বর্গীয় প্রভাবে শৈশবে নূতন ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছিলাম, যাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত ও পবিত্র চরিত্র সম্মুখে দেখিয়া যৌবনের পাপ-প্রলোভন পরীক্ষা ও সংগ্রামের পথে শক্তি লাভ করিতাম, যাঁহার অনুপ্রাণনায় ও উৎসাহে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন অভ্যাস করিয়াছিলাম, যাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে হৃদয় নানা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, শুভ চিন্তা ও সাধু অনুষ্ঠানের সংকল্পে এখনও উন্নীত হয়, যাঁহার স্বদেশ-প্রেম, আত্মত্যাগ, বিনয়, সেবাপরায়ণতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা বঙ্গদেশে নূতন যুগের প্রেরণা দিয়াছিল ও বঙ্গীয় যুবকসমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল, সেই রমাকান্তকে আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। আমাদের পরিবার, আমাদের গ্রাম, আমাদের জিলা, আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্মমণ্ডলী সকলি রমাকান্তের অভাবে দরিদ্র ও মৃতপ্রায় হইয়া আছে। রমাকান্ত! তোমার মত চরিত্রবান্, নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, সংযমশীল ও মধুর-প্রকৃতি নেতার বড় প্রয়োজন—আজ বাঙালীসমাজ তোমাকেই আত্মাতে আত্মাতে অবতীর্ণ দেখিতে চায়। (৪।৫।২২)

আজ তেইশ বৎসর হইল তোমার ভক্ত সন্তান, রমাকান্তকে তোমার শান্তিক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছ। আজ তিনি তোমার অনন্তজগতের

কোন্ অজ্ঞাতলোকে অন্তহীন জীবনের উন্নতিশীল পথে চলিতেছেন তাহা তুমিই জান। তোমার হাতে জীবন সমর্পণ করিয়া তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া, তোমার পূজায় সেবায় জীবন চালিয়া দিয়া প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সম্পন্ন করিতে যিনি অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি পরলোকে যে তোমারই করুণা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আরও উন্নততর পবিত্রতর সমাজে প্রেম ও সেবার অনুশীলন করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি কৃপা কর আমরা যেন তাঁহার ব্রত উদ্যাপন করিতে পারি, তাঁহার মত ভক্ত, প্রেমিকও সেবাপরায়ণ হইতে পারি। তিনি যেমন বিশ্বমানবের সহিত এক-হইয়া সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে, সকল জাতিবর্ণ-ধর্ম্মসম্প্রদায়ভূক্ত মানুষের মধ্যে প্রেম প্রসারিত করিতেন, সত্য হইতে, ন্যায় হইতে, ধর্ম্ম হইতে কখন ভ্রষ্ট হইতেন না, নির্ভয়ে মঙ্গলের পথে বিচরণ করিতেন, অন্যায়, অধর্ম্ম, অশুভ, অসত্যকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইতেন ও দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের কল্যাণের জন্য নিজের ব্যক্তিগত পরিবারিক ও সাংসারিক স্বার্থকে অম্লান-বদনে পদদলিত করিতেন, তেমনি আমাদের প্রাণে তুমি শুভবুদ্ধির প্রেরণা দাও যেন তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে পারি। (৩।৫।২৯)

তুমি আমার গুরু, তুমি আমার উপদেষ্টা, তাই জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক চৈতন্য অন্তরে প্রেরণ কর। কিন্তু আমি ত তোমার বাণী শুনিয়া চলিতে পারি না, ভুল বুঝি, ভুল করি, ভুল জানি, ভুল মানি। তোমার কৃপায় অনেক সাধু ভক্ত পাইয়াছি, ঋষি যোগী-দের জীবনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়াছি। তুমি সখা হইয়া, বন্ধু হইয়া আমার নিকট জীবনের পথ দেখাইবার জন্য এমন বিশ্বাসী মহা-জনদের সঙ্গ দিয়াছ যাহারা তোমার মধ্যে জীবন পাইয়া তোমার

সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রমাকান্তের জীবন যদি আমাদের সম্মুখে না ধরিতে, তবে আমি কোথায় কোন্ অন্ধকার অরণ্যে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া থাকিতাম তাহার কি ঠিকানা আছে? কলিকাতার অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যে যৌবনের অদম্য প্রবৃত্তির স্রোতে কুসংসর্গে কুআলাপে হয়ত আমার জীবন-মুকুল স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন হইয়া অঙ্কুরেই বিলীন হইত। তোমার কৃপা ধন্য, তুমি এই মৃত্যু হইতে রমাকান্তের পুণ্যপ্রভাবের ভিতর দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ। (৪।২।৩১)

(৪) রমাকান্ত সংসারে নাই, কিন্তু তোমার স্বর্গের অমর দেবতাদের সঙ্গে এক হইয়া তিনি তোমার শান্তি-ধামে আছেন। থাকা আর না থাকা, বাঁচা ও মরা, অস্তিত্বযুক্ত সত্য ও অস্তিত্বহীন কল্পনা, বাস্তব ও ভাব সত্তা—এই দুই এর মধ্যে অনাদি কাল হইতে মানব সমাজে যে ব্যবধান সৃজন করা হইয়াছে তার মূলে তোমার অসীম জ্ঞান ও মঙ্গল ইচ্ছা। মানুষ আজ আছে কাল নাই, দেহ তার নশ্বর, জীবন তার অনিত্য মরণশীল, এজন্যই তাহার দেশ কালের অতীত হইবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, অনন্তকালে বাঁচিয়া থাকার জন্য এত সাধ, এজন্যই অমরত্বের পিপাসা, এজন্যই তোমার কৃপার আমাদের এত নির্ভর ও ভরসা। তুমি এক এক জন মানুষকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া পাঠাও যাহাতে তাঁহারা তোমার স্বরূপ মানবসমাজে প্রকাশিত করিতে পারেন। রমাকান্ত এরূপ এক জন ভক্ত সন্তান ছিলেন, যিনি আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াতেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। তোমার সেবায় তোমার পুত্রকন্যাদের সেবায়, তোমার উপাসনায়, তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে, নিজের আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিনের পর দিন আপনার সকল শক্তি, সকল অর্থ, সকল অবসর নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। (৩।৫।৩৪)

দ্বিতীয় স্তবক

স্বদেশীযুগের কর্ম্মবীর আত্মত্যাগী রমাকান্ত রায়।*

(জন্ম ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ, ৩রা মে)

গত বৃহস্পতিবার আমরা রমাকান্ত রায়কে শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছি। যিনি বাল্যকালে নির্ভীকতা, সৎসাহস, সত্যান্বেষণ, সত্যানুসরণ ও ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন ও সমস্ত যৌবন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অমূল্য জীবনের হঠাৎ যে এই পরিণতি হইবে, আমরা কেহ তাহা জানিতাম না। ১০ই বৈশাখ সংবাদ পাইলাম রাণীগঞ্জে তাঁহার জ্বর হইয়াছে। বরিশালের ঘটনা শুনিয়া তাঁহার স্বাভাবিক স্থির বুদ্ধি চঞ্চল হইয়াছে; "আমি কেন বরিশালে গিয়া আর দশজনের সঙ্গে মার খাইলাম না।" এই বলিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন। এবং সময়ে সময়ে "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" বলিয়া আকুল হইতেছেন।

আমরা তখন মনে করি নাই যে রোগ সাংঘাতিক হইবে। তারপর খবর আসিল, জ্বর সহজ নয়। কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবক তাঁহার সেবার জন্য রাণীগঞ্জ গেলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। রোগীর অবস্থা ভাল দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাণীগঞ্জে সেবা

* সঞ্জীবনী পত্রিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি (বৃহস্পতিবার ২৭এ বৈশাখ, ১৩১৩ সাল, 10th May 1906. এর সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)।

শুশ্রূষার বহু বিঘ্ন দেখিয়া রমাকান্ত বাবুকে কলিকাতা আনয়ন করা স্থির হইল। ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস ও রমাকান্ত বাবুর কয়েকজন আত্মীয় রাণীগঞ্জ গমন করিয়া তাঁহাকে বুধবার প্রাতে কলিকাতা আনিলেন। এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির অনুরক্ত ভাইগণ তাঁহার শুশ্রূষার জন্য তখনই যাওয়ামান হইলেন, কিন্তু রমাকান্ত বাবুর একজন আত্মীয় বলিলেন "ইহাদের মুখ দেখিলে তিনি বড় ব্যাকুল হন, ইহাদিগের যাওয়ার প্রয়োজন নাই।" বুধবার রাত্র ১০টার পর হইতে ঘোর বিকার হইল। বিকারের অবস্থায় রোগযন্ত্রণায় প্রাণ যখন ছটফট করিতেছিল তখনও একবার প্রাণ ভরিয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে ডাকিয়া লইলেন। বৃহস্পতিবার উষালোকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যে দেশে সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে যে দেশে ন্যায় নাই, ধর্ম্ম নাই, সে দেশ ত্যাগ করিয়া অমরাত্মা যেন ঘৃণা ক্রোধে অভিমানে চলিয়া গেল। প্রিয় জন্মভূমি লাঞ্ছিত হইতেছে, প্রিয় স্বদেশী যুবক ও বালকগণ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হইতেছে অথচ তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য নাই। রমাকান্ত সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ দেহ দংশন করিতেন। যৌবনের সমস্ত তেজ ঈশ্বর ও জন্মভূমির সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বর ও জন্মভূমির জন্য সমস্ত ক্লেশ প্রফুল্লচিত্তে বহন করিতেন। রোগশয্যায় পড়িয়া যখন হীনবল হইলেন, তখনও জন্মভূমির লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে একান্ত অধীর হইয়া উঠিতেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতে তাঁহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ ভগবানের নিকট প্রার্থনান্তর তাহার দেহ পুষ্প-মালায় সজ্জিত করিয়া তাহার প্রিয় এন্টি-সার্কুলার সোসাইটীর কার্য্যালয়ে লইয়া আসিলেন। এখানে শ্বেতপুষ্পে.

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাঁহার দেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন এবং তথায় তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হইল। বেলা ১১টার পর সকলে শ্মশান ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১২টার সময় ঈশ্বরারাধনা করিয়া চিতাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। রমাকান্ত রায়ের পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল।

রমাকান্ত রায়ের বাল্যজীবন :— বংশের কথা—শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে ১৮৭৩ খৃঃ রমাকান্ত রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালীকিশোর রায়, সেই অঞ্চলে একজন সুবিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। জলসুখা গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতেই সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদারদের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রমাকান্ত রায়ের পিতা ও মাতামহকুল হইতেই গ্রামের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। জলসুখার জমিদার-গণ দানশীলতা ও ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমান রেলওয়ে ইত্যাদি নির্ম্মানের পূর্ব্বে তীর্থপর্য্যটন অতি দুঃসাধ্য ছিল। রমাকান্ত রায়ের মাতামহগণের অনেকেই শ্রীহট্ট হইতে পদব্রজে পুরী ও নৌকা-যোগে মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থদর্শন করিতে বহির্গত হইতেন। এখনও প্রায় সকল তীর্থস্থানেই তাহাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। রমাকান্তের বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার মাতা পুরী গমন করেন। ঐ সময় পথে শিশু রমাকান্ত অতি রুগ্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ছিল না।

রমাকান্তেরা পাঁচ সহোদর—জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত, রাধাকান্ত ও লক্ষীকান্ত এবং কনিষ্ঠ শ্রীকান্ত। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়; সুতরাং পিতৃব্য মথুরচন্দ্র রায়ের হস্তেই উঁহাদের লালন পালনের ভার ন্যস্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন এবং রমাকান্তের আন্তরিক শ্রদ্ধাও লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন

হওয়াতে রমাকান্তের ভ্রাতৃভাব বিশেষ ভাবে উন্মেষিত হইয়াছিল। দেশে অনেকেই ইহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া ডাকিত।

শিক্ষা :— জলসুখার কৃষ্ণগোবিন্দ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে রমাকান্ত শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই স্কুল তাঁহারই মাতামহ প্রসিদ্ধ সদাশয় জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ রায়ের স্থাপিত। রমাকান্ত এখান হইতে ১৮৯০ অব্দে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন ও শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ঢাকা কলেজীয়েট স্কুলে গমন করেন। সেখান হইতে আবার ১৮৯৩ অব্দে শ্রীহট্ট ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৯৪ অব্দে গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করেন। তৎপর কলিকাতায় সিটিকলেজে ভর্তি হইয়া দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন।

বাল্যচরিত্র :— রমাকান্তের ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী অতীব মূল্যবান। ঐ সময়েই তাঁহার চরিত্রের অনেক বিকাশ হয় ও ভাবী কার্য্যের বীজ রোপিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে জলসুখার তখনকার সামাজিক অবস্থা রমাকান্তের চরিত্র গঠনের বড়ই অনুকূল ছিল। ঘন ঘন তীর্থ পর্য্যটন-জনিত দেশ ও লোক সম্বন্ধে তাহার আত্মীয় স্বজনের যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে তেমন প্রায়ই দেখা যায় না। গুরুজনদের নিকট নানা স্থানের গল্প শুনিয়া রমাকান্ত সাধারণ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। এই সাধারণ জ্ঞানের বলেই গ্রামের স্কুলে বিশেষ পরিশ্রম না করিয়াও ভাল ফল দেখাইতে পারিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব ছিল। একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে তাহাকে দেখা যায় নাই। কিন্তু রমাকান্তকে সকলেই ভয় করিত। কারণ তাঁর সৎসাহস বড়ই প্রবল ছিল। কোন অন্যায় দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ শাসন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। যাকে যত বেশী ভাল বাসিতেন, তারই দোষ দেখিলে ততবেশী শাস্তি

দিতেন। তবে সে শাসনেও কেমন একটি মধুর ভাব থাকিত যে তাহাতে হাসি বই কখনও কান্না পাইত না।

খুনের অভিযোগ :— খেলাতে রমাকান্ত খুবই পটু ছিলেন। কবাটী ক্রিকেট প্রভৃতিতে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। রমাকান্ত যখন মধ্য ইংরাজীর চতুর্থশ্রেণীতে পড়েন তখন একবার খুনের অভিযোগে রাজদ্বারে নীত হন। ক্রীকেট খেলার সময় ঘটনাবশত একটি বালক সাংঘাতিক রূপে আহত হয় ও সেই আঘাতেই মারা যায়। এই উপলক্ষে শত্রুপক্ষীয় অন্য একজন জমিদারের উত্তেজনায় রমাকান্ত ও অন্য কয়েক জন বালকের নামে খুনের অভিযোগ আনা হয়। এই সময় গ্রেপ্তার করিয়া যখন তাহাদিগকে থানায় আনিবার চেষ্টা করা হয় তখনও রমাকান্ত অটল ও নির্ব্বিকার; এমন গুরুতর অভিযোগে পড়িয়াও নির্ভীক-চিত্তে বালক রমাকান্ত উকিলদের জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া প্রশংসা লাভ করেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ টিকিতে পারে নাই।

রমাকান্তের নেতৃত্বগুণও ছাত্র-অবস্থায়ই দেখা যায়। পল্লীগ্রামে শীতকালে বনভোজন প্রায়ই হইত। তারজন্য চিরপ্রচলিত প্রথামত চুরি করিয়া সব জিনিষ সংগ্রহ করিতে হয়। এবং কাটা ঘায়ে নুন দেওয়ার ন্যায় যার জিনিষ চুরি করা হয় তাকেই কতক উপহার দিয়া জ্বালাতন করিতে হয়। এই সকল ব্যপারে নেতৃত্ব লাভ বিশেষ চতুর লোক না হইলে সম্ভবে না। রমাকান্ত সকলের স্বীকৃত নেতা ছিলেন। রমাকান্তের রন্ধনপ্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তরকারী কোটা, বাটনা বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্বাদু কোপ্তা কালিয়া পর্যন্ত রন্ধন করিতে জানিতেন।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে রমাকান্তের বড়ই ভাব ছিল।

তিনি সর্ব্বদা তাদের পড়ায় সাহায্য করিতেন। এবং খেলায় যোগ দিতেন। রমাকান্তের সঙ্গে প্রায় সর্ব্বদাই একদল শিষ্য ঘুরিত। বাল্যাবস্থায় রমাকান্তের মনে কতকগুলি উচ্চভাব জাগরুক ছিল। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির উন্নতির চেষ্টা সেই বয়সেই তাহার সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। নিজগ্রামে মেয়েদের লেখা পড়া শিখান ও প্রাচীন বেশ ভূষা ও কুপ্রথার সংস্কার কার্য্যে রমাকান্ত অগ্রণী ছিলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ গুণে এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

জাতিভেদ জ্ঞান রমাকান্তের ছেলেবেলাতেই ছিল না। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে বিথঙ্গল গ্রামে কয়েকজন সঙ্গীসহ গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় রাস্তায় ক্ষুধা হয়; কিন্তু সঙ্গে খাবার ছিল না। তখন নৌকার মাঝিকে গ্রামে খাবার অন্বেষণ করিতে বলেন। মাঝি বলে যে সম্মুখের গ্রামে তাহার এক আত্মীয় আছে, সেখানে কিছু চিড়ে মিলিতে পারে। গ্রামে যাইয়া মাঝি কিছু চিড়া লইয়া আসিল। এবং নিজে তাহার আত্মীয় বাড়ীতে ভাত খাইতে গেল। রমাকান্ত তখন তাহার জন্য ভাত আনিতে বলিলেন। মাঝি শুনে অবাক, কারণ তাহার আত্মীয় জাতিতে চণ্ডাল। কিন্তু রমাকান্ত ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি মাঝি ও সঙ্গীদের ওজর আপত্তি না শুনিয়া ভাত আনাইয়া খাইলেন। তখনকার সমাজের যে অবস্থা তাতে এজন্য জাতিচ্যুত হওয়ার কথা ছিল। রমাকান্ত বাড়ী ফিরিয়া প্রকাশ্যে সে কথা প্রকাশ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিলেন।

পৌত্তলিকতার প্রতি এ সময়েই রমাকান্ত বিশ্বাসহীন হন। তখনকার সময়ে বালকেরা রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবৎগীতা প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রায়ই পাঠ করিতেন। এই সুযোগে রমাকান্ত হিন্দু

পুরাণাদি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করেন। অসম্ভব ও কৌতূহল-জনক দেবদেবীর গল্প লইয়া বালক রমাকান্ত তর্ক বিতর্ক করিতে ভয় করিতেন না। কার্য্যতও দেব-দেবীর মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতেন না। মধ্যইংরাজী পরীক্ষা পাস করার পূর্ব্বেও উপরোক্ত ভবগুলি রমাকান্তের হৃদয়ে প্রকাশ পায়। তৎপর যখন অধ্যয়নার্থ প্রবাস গমন করেন তখন অন্যান্য অনেক গুণের পরিচয় দেন। বন্ধুভাব তার মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব থাকিত এবং সকলের হিতসাধনেই তিনি অগ্রণী ছিলেন। অনেক স্থলেই তাঁর বিশেষ বন্ধু লাভ হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে এরূপ আন্তরিক স্নেহের ভাব ছিল যে সেরূপ ভাব সাচরাচর দেখা যায় না। কাল ও দূরত্বের প্রভাবে তাঁর বন্ধুতা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তার অসংখ্য প্রমাণ পরে দিয়াছিলেন।

রমাকান্তের ছাত্রাবস্থায় মেস ভিন্ন অন্য ছাত্রাবাস ছিল না। ঐ সকল মেসের ম্যানেজারী করিতে রমাকান্ত বড়ই নিপুণ ছিলেন। কি অদ্ভুত কৌশলে স্বল্প ব্যয়ে সকলরূপ সুবন্দোবস্ত করিতেন তা বুঝা ভার ছিল। তাঁর হাতে কার্য্যভার থাকিলে আর কাহা-রও কোন বিষয়ে চিন্তা থাকিত না। মেসের জীবনে প্রায়ই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে। রমাকান্তের কোমল হৃদয়ে সে জন্য ছাত্রজীবন বড় প্রিয় ছিল। তার এ ভাবটুকু জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। সহবাসীদের রোগে শোকে রমাকান্ত অতি উৎকৃষ্ট সেবক ছিলেন। তিনি শুধু অকাতরে রোগের সময় ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা করিতেন এমন নয়, তাঁর মধুর স্নেহপূর্ণ ভাবে রোগী বিমর্ষ থাকিতে পারিত না। তাঁর সেবা-শুশ্রূষাতে কত লোকই না চিরকৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

রমাকান্তের কথাবার্ত্তায় বিশেষত্ব এই ছিল যে তাতে রহস্যাত্মক শব্দই বেশী থাকিত। তাঁর ঘনিষ্টতার পরিমাণ অনেকটা রহস্যাত্মক শব্দের পরিমাণ দ্বারা বুঝা যাইত। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যত বেশী হইত রহস্যের ভাবও তত বেশী থাকিত। এই বিষয়ে তাঁর অদ্ভূত শক্তিও ছিল। অনেক সময় যাকে লক্ষ্য করিয়া কথা হইত, সে ছাড়া অন্যের নিকট সে আলাপ বোধগম্য হইত না। কথার ন্যায় নিজের ভাবভঙ্গীর উপরও অসাধারণ প্রভাব ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে হাস্যমুখ বিষাদময় করা আবার বিষন্নকে প্রফুল্ল করা তাঁর সহজসাধ্য ছিল। একদিন স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে গাম্ভীর্য্য পরীক্ষার জন্য কে কত শীঘ্র হাসে, তার চেষ্টা করা হয়। যত ছাত্র ছিল প্রত্যেককেই রমাকান্ত মুহূর্ত্তমধ্যে হাসাইয়া দেন কিন্তু তাঁকে কেহই বহু চেষ্টায় হাসাইতে সমর্থ হয় নাই।

জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা :— সাধারণ লোকের উপর তাহার প্রীতি যেমন অল্প বয়সে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। একদিন পথে যাইতে রমাকান্ত দেখিতে পাইলেন যে এক জন ভিক্ষুক ওলাউটাগ্রস্ত হইয়া রাস্তার পাশে পড়িয়া আছে। রমাকান্ত তখনই দুচারি জন লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন ও যথা সম্ভব ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার সাহায্যে ভিক্ষুক আরোগ্য লাভ করে। নতুবা পথেই তার জীবন শেষ হইত, সন্দেহ নাই। আর একবার একটি বিদেশী নৌকার মাঝি পীড়িত হইয়া পড়ে। মাঝিটি বন্ধু-বান্ধব হীন এবং নীচ জাতীয় ছিল। তার শুশ্রূষার লোক কেহ ছিল না। রমাকান্ত সে সংবাদে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি নিজে গিয়ে তার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। এবং তাঁর অনুপস্থিতি কালে যাহাতে শুশ্রূষার অভাব না হয় সে জন্য পালা করিয়া সর্ব্বদা

রোগীর কাছে থাকিতে আরও কয়েকটি লোক নিযুক্ত করিলেন। লোককে বিগলিত করিবার এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে, নীচ জাতি বলে যারা পূর্ব্বে লোকটিকে স্পর্শ করে নাই, তাহার দৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় তাহারাই শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

একবার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কোন বন্ধুকে ট্রেনে উঠাইবার জন্য রমাকান্ত কয়েকজন সঙ্গীসহ গিয়াছিলেন। তখন রাত্রি অনেক অথচ খাওয়া দাওয়া বাকী ছিল। সুতরাং বন্ধুটিকে বিদায় দিয়াই সকলে গৃহমুখে ব্যস্তভাবে ফিরিলেন। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময় একটি গরীব লোক তাহাকে এক খানা টিকেট দেখাইয়া বলে সে ট্রেন ধরিতে পারে নাই, এবং পরের ট্রেনে যাওয়াও অনাবশ্যক, কাজেই তার মিছামিছি পয়সা লোকসান হইল। সঙ্গী যারা ছিলেন তারা কেহই তার কথায় মন দিলেন না কিন্তু রমাকান্ত তখনই ফিরিলেন এবং টিকেট খানি লইয়া ভাড়া ফেরৎ পাওয়া যায় কিনা আপিসে তার খবর লইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল ষ্টেশন মাষ্টার হুকুম দিলে ভাড়া ফেরৎ মিলিবে। তখন ষ্টেশন মাষ্টারের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তখন তাঁকে পাওয়া গেল না। সঙ্গীরা সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং লোকটিকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে যাইতে বলিয়া ফিরিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রমাকান্ত সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও ভাড়া ফেরৎ লইয়া লোকটিকে দিলেন। ভাড়া যদিও নিতান্ত অল্প ছিল, তবু গরীব লোকটির পক্ষে তাহাই বেশী। পয়সা ফেরৎ পাইয়া লোকটি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রমাকান্ত সঙ্গীদের তিরস্কার শুনিতে শুনিতে নীরবে চলিলেন।

তৃতীয় স্তবক

স্বদেশী আন্দোলনে রমাকান্ত রায় *

কর্ম্মক্ষেত্রে এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়াই আমাদের তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়। যখন বঙ্গদেশ বিভাগ হইয়া গেল সমস্ত দেশে একটা "গেল গেল জাগ জাগ" এই রব পড়িয়াছিল। যখন শত শত যুবক জাতীয় অবমাননায় অস্থির হইয়া প্রতিদিন গোলদীঘিতে আসিয়া উপস্থিত হইত, কি করিতে কিছুই যখন স্থির ছিল না, তখন আমাদের অনেকের দৃষ্টি সেই শালপ্রাংশু হইবে কে করিবে মহাভূজ রমাকান্তের প্রতি পড়িয়াছিল। তিনি অন্যান্য যুবকগণের ন্যায় প্রতিদিন যেখানে দেশের কথা হইত, সেই স্থানেই উপস্থিত থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইলাম, রমাকান্ত বাবু আমাদের নেতা। তিনি প্রথমে জাতীয় সংকীর্ত্তনের দল বাহির করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সেনাপতির ন্যায় তিনি চলিয়াছেন। পশ্চাতে আমরা "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিতে করিতে গাহিয়াছি :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই॥"
"তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।"

কয়দিন পরে কলেজ স্কোয়ারে একটি সভা হইতেছিল। রমাকান্ত বাবু ও আমি একটু দূরে কথা বলিতেছিলাম। কে সংবাদ দিল, Burn & Co'রএর হতভাগ্য কেরাণীগণ সাহেব কর্ত্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সকলে এক যোগে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনিবাই তিনি বলিলেন, আমাদের দেখা উচিত তাঁহাদের মধ্যে যাহারা গরীব তাহাদের পুত্রকন্যাদের কি উপায় হইতেছে। আমাকে বলিলেন, কাল সকালে আপনি হাওড়া যাইবেন, আমিও যাব, আমার সঙ্গে দেখা হইবে। যথাসময়ে আমি হাওড়া গিয়া দেখি আমার আগেই

* ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত, "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সনে প্রকাশিত।

তিনি সেখানে উপস্থিত। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া কেরাণী বাবুরা তাঁহাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনিও তাঁহার স্বভাব-সুলভ কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন না। আমি যখন তাঁহার কাছে গেলাম, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আগ্রহের কারণ কি? তখন কেরাণীগণ আসিয়া আদর করিয়া রমাকান্তবাবুকে লইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দুঃখময় জীবনের প্রতিদিনের অবমাননার কথা অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন "আত্মসম্মান-হীন জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল। আপনারা যে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, জানিবেন এ পথে আপনাদিগকে অনেক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতে হইবে। একদিকে দারিদ্র্যের ঘোর কশাঘাত, অপর দিকে মদোন্মত্ত ফিরিঙ্গীর পদাঘাত, আপনাদিগকে দরিদ্রতাকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আপনাদের কাজের উপর সমস্ত কেরাণী জাতির সম্মান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আপনাদিগের পশ্চাতে, আর আমরা আপনাদের জন্য, আপনাদের ক্ষুধার্ত্ত সন্তানসন্ততিদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।" তাঁহার এই জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ কথাগুলি হতভাগ্য কেরাণীকুলকে কি প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিল, চিরপদদলিত নির্জ্জীব কেরাণীদিগের প্রাণে কি আশার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি জীবনে ভুলিবেন না। একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ কেরাণী আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "মহাশয়! কি বিপদে পড়িয়াছি, অল্পবেতনের চাকুরীই এক মাত্র অব-লম্বন, মাহিনা পাইতে দুই দিন বিলম্ব হইলে ৩।৪টি ছেলেমেয়ে লইয়া উপবাস করিতে হয়। গত মাসের Pay Bill প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া মাহিনা দিতেছে না—কি ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে বলিতে পারি না।

ছেলেদের কষ্ট আর সহ্য হয় না বলিয়া প্রত্যহ সমস্ত দিন এই মাঠে আসিয়া বসিয়া থাকি। এর উপর যদি চাকুরি যায় তা'হলে মরিতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই; সাহেবের লাথি আর সহ্য হয় না। আমরা ভাবিয়াছিলাম এবার মৃত্যু ভিন্ন অন্য সহায় নাই, কিন্তু আজ আপনাদের কথায় আশা হইতেছে, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন আমাদের পুত্র কন্যাগণ অনাহারে মরিবে না।" তিনি বেশী কোন কথা বলিলেন না। কথা তিনি বলিতে পারিতেন না, কাজেই তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দিতেন। সেই দিন দরিদ্র কেরাণীগণের নামের তালিকা করিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতে সংবাদ পত্রে তাহাদের অবস্থা জানাইয়া দেশের লোকের সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। অনেকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "মনে আছে অনেকের এক্ষণে সাহায্যের প্রয়োজন; শুধু খবরের কাগজে সাহায্য প্রার্থনা করিলে হইবে না, বাড়ী বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন। কাল হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে"। তিনি ওয়ার্ড ভাগ করিয়া দিলেন। অতি প্রত্যূষে তিনি স্বয়ং বাহির হইলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। একদিনে ২০০৲ টাকা তুলিলেন; শুনিলাম সেদিন প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে রাস্তায় যে কোন পরিচিত লোকের বাসায় উঠিয়া স্নানাহার করিয়া লইতেন, যে দিন সুবিধা না হইত তাহাও করিতেন না। শরীরে দুঃখ কষ্টের জন্য ভ্রুক্ষেপও নাই। আজ যে যুবকগণের মধ্যে অনেকে সমগ্র শরীর ও মন দিয়া দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহার মূলে রমাকান্ত বাবুর জলন্ত দৃষ্টান্তের প্রভাব। দেশের কাজে একেবারে আপনাকে দিতে হইবে, সুখ দুঃখ বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, বর্ষার বারি ধারা, হেমন্তের

শিশিরপাত, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ মাথায় পাতিয়া লইয়া অক্লান্ত-পদে, বিশ্রামের সুখ ভুলিয়া চলিতে হইবে, ইহা তিনি তাঁহার জীবনে দেখাইয়াছিলেন। এমন একটি ত্যাগী, চিরপ্রফুল্ল কর্ম্মবীর যুবককে সম্মুখে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অনেকে স্বদেশী আন্দোলনে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক দিন দেখিয়াছি যখন দীর্ঘকাল ব্যাপী শারীরিক পরিশ্রমের পর সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছেন, তিনি সহানুভূতিপূর্ণ নয়নে স্নেহস্বরে বলিতেছেন "জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়, সবে আয়রে আয়।" আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত না। একদিন কোন কাজের জন্য ৭।৮ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর হঠাৎ কোন বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান আসিল; সকলে তখন ক্লান্ত, ক্ষুধায় অস্থির। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই—তিনি সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছেন—পশ্চাতে আমরা। হঠাৎ তিনি দাঁড়াইলেন, কাহারও কাছে পয়সা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন, দুইটি পয়সা পাওয়া গেল, তিনি দু পয়সার ছোলাভাজা লইয়া আসিলেন, সকলকে দিলেন। সকলে আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। সে দিন যুবক-গণের এক নূতন শিক্ষা হইল। কাজ করিবার এমনি ব্যাকুল ইচ্ছা ও অসাধারণ শক্তি আর কোথায়ও দেখি নাই। এক দিন কোন কাজে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। ১টার পর সকলে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিয়া শুইলাম। প্রত্যূষে আর একটি কাজ ছিল। দেখি ৪টা বাজিতে না বাজিতে উঠিয়াছেন, সকলকে জাগাইতেছেন। এমন দেখিয়াছি সন্ধ্যার সময় তিনি বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি একটুকুও বিশ্রাম না করিয়া পরদিন বেলা দশটার সময় ফিরিতেছেন। দিনের পর দিন এইভাবে চলিয়া গিয়াছে। কোন কাজ করিবার আছে দেখিতে পাইলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। যখন কলিকা-

তার দোকানদারগণ স্বদেশী আন্দোলনের সুবিধা লইয়া দেশীবস্ত্রাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতেছিল তখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহে সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সমক্ষে প্রস্তাব করা হইল দেশী দ্রব্য বিনালাভে যুবকদিগের দ্বারা বিক্রয়ের কোন উপায় করা যায় কি না। সকলে আনন্দের সহিত এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সে মবার সন্ধাব সময় এ প্রস্তাব হইল, মঙ্গলবার হাওড়ার হাট, রমাকান্ত বাবু বলিলেন কালই তিনি হাটে গিয়া কাপড় লইয়া আসিবেন। সেদিন শুল্ক পরীক্ষার জন্য ৬০৲ টাকা লওয়া হইয়াছিল। কাপড় ক্রয় সম্বন্ধে সকলেই সমান অজ্ঞ, হাটে গিয়া দেখি একজন দোকানদার কাপড় খরিদ করিতেছে, রমাকান্তবাবু তাঁহার আগে বসিলেন, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন "বুঝিয়াছি এখন কিনিতে পারিব।" ঠিক মূল্যে কাপড় কেনা হইল। প্রশ্ন উঠিল কাপড় লওয়া যায় কি প্রকারে? তিনি বলিলেন মুটে-ভাড়া দিয়া অনর্থক দাম বাড়াইয়া কাজ নাই, কত সস্তায় দেশী-কাপড় বিক্রয় করা যায় এইবার দেখিব। এই বলিয়া মোট মাথায় তুলিলেন, আমরাও তাহার অনুকরণ করিলাম। কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্বয়ং একবোঝা কাপড় লইয়া বিক্রয়ের জন্য বাহির হইলেন পশ্চাতে পশ্চাতে যুবক দল গাহিতে লাগিল—

"মায়ের দেওয়া মোটাকাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

সে দিন যে শক্তি ও আনন্দ যুবকগণের প্রাণে জাগিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। রাস্তার লোকরা তাঁহাকে এই ভাবে দেখিয়া "বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সকলের প্রাণে স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা নূতন ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। যুবকগণ সেদিন তাহার কাছে আর এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

সকলে স্বদেশের নামে কর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন। ত্যাগের শক্তি জ্বলিয়া উঠিল, দলে দলে যুবকগণ এই গৌরবময় কাজের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। পরীক্ষার্থী পরীক্ষা ফেলিয়া ভবিষ্যতের আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কাজ করিবার জন্য, স্বদেশের সেবায় মুটে সাজিবার জন্য সকলে পাগল হইয়া উঠিলেন। ৩ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাপড় বিক্রয় হইয়া গেল। কতলোক কাপড় না পাইয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিলেন। আমরা ভাবিলাম উপায় কি? আর কাপড় পাওয়া যায় কোথা? তিনি বলিলেন "হাবড়ার হাটে যাহারা দূর দেশ হইতে কাপড় লইয়া আসে তাহারা দু'এক দিন বড়বাজারে অপেক্ষা করে, চল তাহাদের সন্ধানে যাই" সেইদিনই অনুসন্ধানে তাহাদের বাহির করা হইল। অনেক টাকার কাপড় কেনা হইল। তাহার পর হইতে রীতিমত কাজ আরম্ভ হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় প্রত্যেক কাজের মূলে তাঁহার শক্তি ও চেষ্টা কি অসাধারণ কাজ করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রতিদিনের জীবন, আহার বিহার পাঠ, সকলই স্বদেশী আন্দোলনের পরিচয় দিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। যেদিন রঙ্গপুরের ছাত্রগণের নির্য্যাতনের সংবাদ আসিল তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। রঙ্গপুর ছুটিলেন সঙ্গে শচীন্দ্রপ্রসাদ। তাঁহার প্রাণস্পর্শী আহ্বানে এবং শচীন্দ্রপ্রসাদের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সমস্তদেশে প্রচারিত হইল, ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশ পালন করিতে এবং

শাস্তি গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহে। রমাকান্ত এই মন্ত্র সেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত করিলেন।

"তুমি যা দিয়াছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।"

রাজশক্তির অপব্যবহারের মূলে সে দিন এক আঘাত হইল এবং জাতীয় জীবনের এক নূতন সূচনা আরম্ভ হইল। কলিকাতা আসিয়াই এক সভা আহ্বান করা হইল। তাহাতে এণ্টিসারকুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ঈশ্বর ও জন্মভূমির নামে বঙ্গের যুবকগণ সেই সভায় অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সত্য ও ন্যায়ের পতাকা লইয়া রমাকান্ত এবং তাঁহার অনুগত যুবকগণ দেশে এক নূতন জীবনের সূত্রপাত করিলেন। চারদিকে আবার এক নূতন জীবনের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। কলিকাতার যুবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অখণ্ড বঙ্গদেশে এক প্রকাণ্ড ছাত্রসমাজ, একপ্রাণ, এক উদ্দেশ্য একই আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল।

সমস্তদেশে এক আশা ও আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। এত বড় একটা কাজ হইল, কিন্তু তিনি ধরা দিলেন না, উপযুক্ত শিষ্য শচীন্দ্রের হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি দূর হইতে ইহার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। একবার আমি অভিযোগ করিয়াছিলাম—"আপনি বড় বড় কাজের মধ্যে আমাদিগকে ফেলিয়া দিয়া কেন দূরে চলিয়া যান।" তিনি বলিলেন—"ভুল বুঝিয়াছেন, আমি কোনদিন দূরে যাই নাই; আপনাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই আছি, কাজের মধ্যে ফেলিয়া আপনাদিগকে মানুষ করিয়া লইতে চাই। আমি যখন দেখি আপনাদের দায়িত্ব আপনারা পালন করিতে পারিয়াছেন তখন আমি অন্য কাজের জন্য আমার শক্তি নিয়োগ

করি।” সত্য সত্যই তিনি আর এক মহান কার্য্যের সূত্রপাত করিতে-ছিলেন, হায়! হায়! তাঁহার সূচনার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে চিরদিনের জন্য আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের দরিদ্র প্রজাবৃন্দ ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমাদের জাতীয় এক মহান অভাব দূর হইয়াছে, ১৬ই অক্টোবর আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে কর্ম্মবীর রমাকান্তের হাত ইহার মধ্যে কোথায়? কার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাবুদের দুঃখ কষ্ট, মুটে গাড়োয়ান দিগকে বিচলিত করিয়াছিল? কোন্ মহাপুরুষ “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র দেশের প্রজাবৃন্দের কানে দিয়া তাহাদিগের নিদ্রা দূর করিয়াছিলেন?

হায়। হায়! যখন মনে করি তাঁহার দূরদৃষ্টি, যখন দেখিতে পাই এই দুর্ভাগ্যদেশে তাঁহার কার্য্য গ্রহণ করিবার আর কেহ নাই, তখন আর দুঃখ রাখিবার যায়গা থাকে না। আরও দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য কেহই জানিবার অবসর পাইল না, অফুটন্ত পুষ্পের ন্যায় তাঁহার চরিত্রের দেবত্ব চিরদিনই জগতের কাছে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। কি মহত্বে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ ছিল! দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে কি আকুল পিপাসা ছিল! সত্যের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ও অন্যায়ের প্রতি কি দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল! যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে আদর্শ তিনি সম্মুখে ধরিয়াছিলেন জীবনের প্রতিকাজে প্রতি-বাক্যে তাহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, তাঁহার স্বাধীন মুক্ত প্রাণ এই পরাধীন দেশের বন্ধন সহ্য করিতে পারিলেন না। ব্রতের প্রথমেই তিনি আপনাকে আহুতি দিয়া চলিয়া গেলেন। দেশের জন্য এমন আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আর আমরা কোথায় পাইব? বরিশালে আমাদের নেতা হইয়া তাঁহার যাওয়ার কথা;

ছিল, শরীরের অসুস্থতার জন্য যাইলেন না। বরিশাল হইতে আসিবার সময় রানীগঞ্জ গেলাম, তখন তাঁহার ৬।৭ দিন জ্বর। বরিশালের কথা শুনিতে চাহিলেন, আমি সমস্ত বলিলাম, শুনিয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ভগবান! এত অপমান আর সহ্য হয় না।" হায়! হায়! তখনও স্বপ্নে ভাবি নাই সত্য সত্যই অসহ্য হইবে। জ্বর ক্রমে বাড়িল। বিকারে কেবল দেশের কথা, বরিশালের অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিলেন। জীবনের শেষ কথা "প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা"। ৩রা মে প্রাতে ৫টার পর প্রাণ-বিয়োগ হইল।

যেখানে পরাধীনতার কঠিন বন্ধন নাই, যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার নাই, সেই চির শান্তিময় স্বাধীন রাজ্যে তাঁহার অমর আত্মা চির বিশ্রাম লাভ করিলেন। আমরা গিয়া দেখিলাম তাঁহার দীর্ঘশরীর ৮মাস ব্যাপী দারুণ পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছে। মৃত্যুর ছায়া সে দেব মুখে পড়ে নাই। যে "বন্দেমাতরম" উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া আমরা বরিশালে প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলাম, যে "বন্দেমাতরম" মন্ত্র তিনি জীবনে প্রচার করিতেছিলেন আমরা একবার শেষ সেই মন্ত্র অঙ্কিত উত্তরীয় তাঁহার বুকের উপর পরাইয়া দিলাম। রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প ও পত্র দ্বারা সমস্ত শরীর সাজাইয়া দিলাম। কপালে শ্বেত চন্দন দিয়া সুগন্ধি এসেন্স দিয়া তাঁহাকে নয়ন জলে ধৌত করিয়া সাজাই-লাম। মাথায় ফুলের উষ্ণীষ পরাইয়া দিলাম। তাঁহার বাটী হইতে শেষবার তাঁহার কর্ম্ম মন্দির এণ্টিসার্কুলার সোসাইটিতে লইয়া আসিলাম। সকলে একই সঙ্গে বিদায়ের জয়মাল্য তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলাম। সোসাইটির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। আমরা হৃদয়ের প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে অশ্রুজলের সহিত চিরবিদায় দিলাম।

চতুর্থ স্তবক

রমাকান্ত রায় ও অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটী

খবরের কাগজে সকলেই পড়িয়াছেন, জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায় আর ইহলোকে নাই। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ ব্যবধান আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। আজ তিনি আমাদিগের নিন্দার ও প্রশংসার অতীত হইয়াছেন। রমাকান্ত বাবুর জীবনী লিখিতে গেলে, মনে হয় লিখিব কি, তাঁহার সমস্ত জীবনত সম্মুখেই পড়িয়াছিল। বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তিনি অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। নৈসর্গিক জগতে দেখিয়াছি, যে কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে একদিন সমস্ত বনভূমি সুগন্ধে প্লাবিত হইয়া যাইত, তাহাই কি জানি কেন বিকাশোন্মুখ অবস্থায় ঝটিকাহত হইয়া পৃথিবীর ধূলা মাটীর সহিত মিশিয়া যায়। রমাকান্ত বাবুও জীবনের প্রভাতকালে বিকাশোন্মুখ অবস্থায় তাঁহার বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কি জানি কেন হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন। একদিন যাহার সুগন্ধে সমস্ত বনস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিত, সে ফুল ফুটিয়া না উঠিতেই অকালে কেন ঝরিয়া গেল তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। দেশের দুর্দ্দিনে রমাকান্তের ন্যায় মাতৃসেবককে ভগবান হঠাৎ কেন ডাকিয়া লইয়া গেলেন তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন কে করিবে? মঙ্গলময়ের এই ইচ্ছার মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যে ফুল দেবপূজার জন্য ফুটিয়া উঠে তাহা পৃথিবীর পাপ মলিন বক্ষে অধিক দিন শোভা বিতরণ করে না, যখনই বিধাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় হয়, তখনই প্রভাত-

---

*১৩১৩ বাং ভাদ্র মাসের "প্রবাসী"তে ৺শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর স্মৃতি তর্পণ।

বাবু লতাপল্লবের স্নেহালিঙ্গন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায়। রমাকান্ত ভগবানের সেবক, দুদিনের জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহার মহিমা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; দেবদূত আসিয়া ডাকিবামাত্র আমাদিগের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আরব্ধ সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের পূর্ণ অভিনয় আমরা আর দেখিতে পাইলাম না, প্রথম অঙ্কেই যবনিকা পড়িয়া গেল।

কিন্তু তাঁহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে না পাইলেও আমরা যতটুক দেখিয়াছিলাম, আজ তাহারই আলোচনা করিতে বসিয়াছি। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ "সঞ্জীবনী"তে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তদপেক্ষা অধিক কিছু আর সংগ্রহ করা যায় নাই। যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁহাকে আমরা শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াছি সুতরাং কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা তাহাকে যতটুক চিনিতে পারিয়াছিলাম তাহাই বলিব।

৭ই আগষ্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহা বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালী যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত এবং সংহত করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এ বিশ্বাস পূর্ব্বে অনেকেরই ছিল না। আমাদিগেরও যে Organisation করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা এই দিন তাহার প্রথম আভাস পাইলাম এবং এই দিনই এই শালপ্রাংশু মহাভূজের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ হইল। রমাকান্ত রায়ের বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘবপু দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে পাঞ্জাবী বলিয়া মনে করিতেন; আমরাও সেদিন তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করিতে পারি নাই। শেষে অনুসন্ধানে জানিলাম তিনিই জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায়। সমাজে এমন দুএকজন লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদিগকে দেখিলেই

মনে হয় যে, তাঁহারা নেতৃত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং মানুষ দলবদ্ধ হইলেই তাঁহারা সমাজের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সে জন্য সমাজে কোনও রূপ বিক্ষোভ বা মতান্তর উপস্থিত হয় না। বরং তাহার বিপরীত হইলেই দলের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহার কারণ এই যে, যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য আসন গ্রহণ করিলে সমাজ ঠিক কলের ন্যায় চলিতে থাকে। রমাকান্ত রায়ের সেই যে ৭ই আগষ্টের বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি, তাহার পরে কলিকাতায় যত মিছিল বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে রমাকান্তের উন্নতমস্তক সকলের অগ্রে দেখা গিয়াছে। আজও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের নেতৃত্বে প্রত্যহ আমাদিগের যে প্রোসেশন বাহির হইতেছে এবং রাজপথে মাতৃনাম গান করিয়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, রমাকান্ত রায় জীবিত থাকিতে তাহার নেতৃত্ব আর কাহারও জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না—তিনি এ পদ সহজেই পাইয়াছিলেন। ইহার জন্য সভাসমিতি করিতে হয় নাই অথবা নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা পোহাইতে হয় নাই। এই সহজ নেতৃত্ব রমাকান্ত রায়ের চরিত্রে এক বিশেষগুণ দেখিয়াছিলাম। একদিকে যেমন নেতা হইয়া তিনি যুবকদিগকে চালনা করিতেন আবার অন্যদিকে প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় এমনই জয় করিতেন যে তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিরাট ছায়ায় শান্তিলাভ করেন নাই যুবকদিগের মধ্যে এমন লোক প্রায়ই দেখি না। নেতৃত্বের সহিত ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব্ব মিলনে তাঁহার চরিত্র এমন মধুর হইয়াছিল যে তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যাইত না। এই গুণ ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিত এবং বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাঁহার চরিত্রে বিশ্বজনীন প্রেমের এমন এক বিকাশ দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র বলিয়া কোনও ইতরবিশেষ ছিল না। সকলকেই তিনি

স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সকলকেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিতেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে অনেক সময় আলাপ এবং আলোচনা হইত ; এই সকল আলোচনায় বক্তৃতার অংশ আমরা লইতাম আর তিনি অনেক সময় শ্রোতা হইয়াই থাকিতেন ; শেষে কাজের সময় দেখিতাম ষোল আনা অংশ তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন, আর আমরা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। দেশের কথা বলিবার সময় তাঁহার চোখে মুখে এমনি বিদ্যুৎদীপ্তি দেখিতে পাইতাম যে, তাহাতে আমাদের মনে দ্বিগুণ উৎসাহ হইত এবং প্রাণে অপূর্ব্ব বল পাইতাম। সে সময় রমাকান্তের সে সৌম্যমূর্ত্তি যেন কোথায় চলিয়া যাইত এবং সেই বিশাল শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া বিদ্যুৎস্ফুরণ হইত।

অকালে এমন কর্ম্মী পুরুষকে হারান দেশের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি আমাদিগের কর্ম্মকেন্দ্র আপ্টি-সারকুলার সোসাইটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাসস্থান সোসাইটী হইতে অনেক দূরে ছিল, কিন্তু এতদূর হইতেও তিনি এত সকালে আসিতেন যে, কেহ কেহ তখন পর্য্যন্ত হয়ত শয্যাত্যাগ করে নাই। প্রত্যুষে তাঁহার সহিত কার্য্যে বাহির হইয়াছি, অক্লান্তভাবে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিতেছি, দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় এবং পরিশ্রমে সঙ্গীরা অবসন্ন হইয়া হয়ত বলিতেছে—"রমাকান্ত বাবু! ২টা বাজিয়া গেল, বাড়ী চলুন, অত্যন্ত বেলা হইয়াছে।" রমাকান্ত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বেলা ত হইয়াছে, কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি সে কাজ ত এখনও হয় নাই।" অমনি শ্রান্তি চলিয়া গেল, কর্ত্তব্যের নিকট সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। এমনি করিয়া কত দিন কত রাত্রি চলিয়া

গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিত, আমরা কেহ রমাকান্তের ক্রোড়ে, কেহ বা হাতে, কেহ বা শরীরের উপর মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতাম, রমাকান্ত বাবু আমাদিগের মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ধীরে ধীরে গাহিতেন—"জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়।" অমনি আমাদিগের প্রাণে তড়িৎ সঞ্চার হইত। রমাকান্ত বাবু সুগায়ক ছিলেন না, তাঁহার এই সকল সঙ্গীতে তালমানের কোন সামঞ্জস্য থাকিত না, কিন্তু তাহা এমন সময়োপযোগী হইত এবং ইহাতে এমন উচ্ছাস ও উদ্দীপনা থাকিত যে, তাহা আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া এক নূতন উন্মাদনা আনিয়া দিত। সে আবেগপূর্ণ সঙ্গীত আজ থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বরলহরী আজিও আমাদের কাণে ঝঙ্কার দিতেছে এবং প্রতিধ্বনি আমাদিগের বক্ষ-প্রকোষ্ঠে আঘাত করিতেছে।

যে দিন এণ্টিসারকুলার সোসাইটীর কাপড়ের মোট মাথায় বহিয়া আনিবার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেদিন তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখে এক নবদীপ্তি দেখিয়াছিলাম। তিনি কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না; কারণ সে কথা শিক্ষিত লোকের মুখে সেই প্রথম শুনিয়াছিলাম। আমি সেই কথাগুলি লিখিতেছি। রমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন—"আমি যখনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইতাম তখনই যাত্রীদিগের প্রতি কুলিদিগের অসম্ভব অত্যাচার দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতাম এবং তাহার মধ্যে প্রায়ই দেখিতাম যে বাবুরা ছোট একটী ব্যাগ বা ছোট একটী পুঁটলি যাহা একজন ভদ্রলোক অনায়াসে হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন তাহাই কুলির মাথায় দিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং দু আনার জায়গায় চারি আনা আক্কেল সেলামী দিয়া ও বিস্তর কটুবাক্য শুনিয়াও বাবুগিরি বজায় রাখিতেন।

সেই দিন হইতে আমার মনে হইত, কেমন করিয়া মিথ্যা সম্মান লাভের এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মন হইতে দূর করিয়া দিব। শেষে জাপানে গেলাম, কিন্তু শিয়ালদহের কুলির অত্যাচারের কথা ভুলিলাম না। জাপানে যাইয়া দেখিলাম সেখানে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক শারীরিক পরিশ্রম করাকে লজ্জার বিষয় মনে করেন না; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের মধ্যে এমনি ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে, যে লোক দশ টাকার মাহিনার চাকুরীর জন্ত যাহার তাহার পাদুকা স্পর্শ করিতে প্রস্তুত, সেই বাজার হইতে ভাঁটা গাছটী হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে না, কারণ সে যে ভদ্রলোক—এ কাজ করিলে যে তাহার সম্মান নষ্ট হইবে। কেমন করিয়া লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিব, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য জগতের এবং নবজাগ্রত জাপানের এই "Dignity of labour" এর (শ্রমগৌরবানুভূতির) উচ্চ আদর্শ আমাদিগের দেশের লোকের নিকট ধরিব, এই বিষয় আমি চিন্তা করিতাম। এক এক সময় মনে হইত শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া কোট প্যাণ্টালুন পরিয়া ভদ্রবেশেই কুলির কাজ করিব, দেখি যদি তাহাতে বাবুদিগের ভ্রম কাটিয়া যায়। আজ আমার সেই আশা ফলবতী হইয়াছে, ভদ্রবেশে কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার পথে পথে ফেরী করিয়া বেড়াইব এবং দেশের লোকের নিকট এক নূতন আদর্শ দেখাইব।" সেই দিনই সোসাইটীর সভ্যেরা কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া প্রথম মহানগরীর বিস্ময়মুগ্ধ জনমণ্ডলীর নিকট মুটের কাজ করিতে বাহির হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্র সন্তানেরা যে দিন কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া লইলেন, সে দিন বুঝিলাম যে আমরা শুধু কাপড়ের মোটই কাঁধে লইলাম না—আমাদের দেশের মোটও মাথায় করিয়া লইলাম। এখন সোসাইটীতে দেখিতে পাই, কত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপড়ের মোট

মাথায় করিয়া অম্লানবদনে গৃহে যাইতেছেন। আমরা আত্মসম্মানের প্রকৃত মর্যাদা এবার বুঝিতে পারিয়াছি ইহা কম লাভ নহে।

এমন কত দিন কত কার্য্যের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সব কথা মনে নাই এবং লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আর দু' একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৩০শে আশ্বিন রাখী সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহানগরীতে এই দিনের গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু তাহাদের মধ্যে অন্যতম। রাখী সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আমাদের আহার নিদ্রা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। আমার বেশ মনে আছে, এই উপলক্ষে কোন স্থানে যাইয়া সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে আমরা একটী ফুটী ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত ভ্রমণে সুখ ছিল, উপবাসে সুখ ছিল, অনশনেও সুখ ছিল, কারণ তিনি দুঃখ দুর্দ্দিনে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। এমন সরল-হৃদয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী সঙ্গী আর পাইব না।

একদিন কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে উপাসনান্তে প্রাণস্পর্শী স্বরে সঙ্গীত হইতেছিল—

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।"

বিশ্বাসী ভক্তের কণ্ঠে যে দিন এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম, সে দিন প্রথমেই ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি রমাকান্ত রায়ের ছবি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক্; পৃথিবীতে যাঁহারা বিশ্ববিধাতার বিজয় নিশান একবার আলিঙ্গন করিয়াছেন, যাঁহারা শোকতাপিত জনগণের হৃদয়-মন্দিরে

তাঁহার পতাকাহস্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে দুঃখ দৈন্য বহিবার শক্তি তিনি দিয়াছেন। তিনি তাহাদি'গর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপাসনার সঙ্গীতে যে বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথমে রমাকান্ত বাবুর জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ভগবানের সেবক না হইলে কেহ কি এমন করিয়া হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারে?

তাঁহার প্রতিজ্ঞার মধ্যে এক ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, অথচ তাহাতে কোনও আড়ম্বর ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যখন রঙ্গপুরে ছাত্রপীড়ন আরম্ভ হয়, তখন রমাকান্ত বাবু ও আমি সেখানে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় শীতের খুবই প্রকোপ; প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে এবং প্রবল বাতাসের জন্য কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। আমরা যখন পদ্মার উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিলাম, তখন শীত অসহ্য বলিয়া বোধ হইল. আমরা কেহই চা পান করিতাম না; কিন্তু শীতের প্রকোপ বশতঃ রমাকান্ত বাবু বলিলেন "চা খাইয়া শরীরটা একটু গরম করা যাক।" সোরাবজীর খানসামা দু পেয়ালা চা আনিয়া দিল, তখন নূতন নূতন আমাদের মনে ছিল না যে সোরাবজীর ভাণ্ডারে দেশী চিনি থাকে না। পেয়ালাটী হাতে লইয়া নাড়িয়া দেখিলাম বিলাতী চিনির দানা চক চক করিতেছে, রমাকান্ত বাবুর নিকট বলিলাম, এ চিনি ত আমরা খাইতে পারি না। অনেক শ্বেতাঙ্গ আমাদিগের দিকে কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল; সোরাবজী এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমাদিগের নিকট কাশীপুরের চিনি এখন নাই, এবার আনাইয়া রাখিব।" রমাকান্ত বাবু গম্ভীর ভাবে খানসমার প্লেটে একটী আধুলি দিয়া পানীয়টুকু পদ্মার গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ষ্টীমারে যাত্রীদের মধ্যে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; সাহেব যাত্রীদের মুখ চোক লাল হইয়া

গেল, আমরা নিঃশব্দে আমাদের আসন গ্রহণ করিলাম। এই ঘটনা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করা হইল না।

অসময়ে আহার, অনিদ্রা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে রমাকান্তবাবুর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এবার তাঁহার অসুখের কিছু পূর্ব্বে রাণীগঞ্জে তিনি এক স্বদেশী সভার আয়োজন করেন; সেখানে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আমাদিগের সোসাইটীর এক শাখা স্থাপন করেন। যাহাতে রাণীগঞ্জের সভাতে আমরা উপস্থিত হই, এজন্য তিনি নিজে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; হায়! তখন জানিতাম না যে রাণীগঞ্জেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইবে।

সেখানে যে কি আনন্দে আমাদিগের সময় কাটিয়াছিল, তাহা মনে হইলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানারূপ কথা বার্ত্তা হইল, শেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়াই পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে রমাকান্ত বাবু একখানি ধর্ম্মপুস্তক হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। ভগবানের নাম তাহার কণ্ঠে সেই শেষ শুনিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই রাণীগঞ্জে তিনি এক নব জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং রাণীগঞ্জ, কলিপাহাড়ী, সীতারামপুর প্রভৃতি অঞ্চলের খনি-ব্যবসায়ী দিগকে লইয়া যাহাতে একটী কয়লা সমিতি গঠন করিতে পারেন, তাহার অনেক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, রমাকান্ত বাবু জীবিত থাকিলে একার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আজ আর তিনি নাই, সুতরাং এই সমিতির কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এবার বরিশাল কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য-ব্যপদেশে আমাকে ময়ূরভঞ্জ যাইতে হয়। সেখানে থাকিতে সংবাদ পাইলাম, রমাকান্ত বাবু আর ইহলোকে নাই; তাঁহার মৃত দেহ পুষ্পমণ্ডিত করিয়া সোসাইটীর হলে সভ্যেরা বহিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার

আত্মার মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রার্থনা হইয়াছিল। কর্ম্মীর বেশে যে গৃহে রমাকান্ত প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে সোসাইটীর জন্ম মফঃস্বলে কার্য্য করিতেছিলেন, জীবনের অবসানে তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই গৃহেই চিরশান্তি লাভ করিল। কর্ম্মের জন্ম যে গৃহ হইতে একদিন তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ কর্ম্মাবসানে তিনি সেখানে সজ্ঞানে ফিরিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণহীন দেহ সেই পরিচিত প্রিয়স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং মৃতেরা যে ভাষায় কথা বলে, তিনি সেই ভাষায় আমাদিগকে জন্মভূমির সেবার জন্ম আকুল কণ্ঠে শেষ আহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন। মরিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে শেষ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন "প্রতিহিংসা"।

বরিশালের পুলিশের লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া তিনি অসুস্থাবস্থায় শয্যাগ্রহণ করেন; সে শয্যা হইতে আর উঠিতে পারেন নাই। প্রবল বিকারের সময় শুধু বরিশালের অত্যাচারের কথাই বলিতেন এবং "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সোসাইটীর সভ্যদিগকে পুলিশ লগুডাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছে, এ নিদারুণ অপমান তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুকালে সোসাইটীর সভ্যদিগকে ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে যাইতে দিতেন না; কারণ তাহাদিগকে দেখিলে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন এবং বিকার আরও প্রবলাকার ধারণ করিত। এই রূপ বিকারের মধ্যে হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আজ আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ওই ঊর্দ্ধলোকে, যেখানে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছেন, মেঘমণ্ডলের মধ্যে তাঁহাদিগের পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া এই

কর্ম্মবীর বাঙ্গালা দেশের যুবকগনকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" কে বলে রমাকান্ত রায় মরিয়া গিয়াছেন? তুমি আমি মরিতে পারি, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর কখনও মরেন না।

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি॥"

যাহা ক্ষণ বিধ্বংসী, রমাকান্তের সেই পঞ্চভৌতিক দেহ অবশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যাহা অমর, যাহা অবিনশ্বর, সেই কীর্ত্তি তাঁহাকে চির-জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

আজ তাঁহার নিকট হইতে আমরা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে পিপাসিত হইয়া তিনি এ বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিকারের ঘোরে চীৎকার করিয়া যখন তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইত, তখন শুশ্রূষাকারীরা তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠে জল দিতেন; কিন্তু পিপাসার শান্তি হইত না। সে ত জলের পিপাসা নয় যে শীতল বারিদানে তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে। সে আকণ্ঠ পিপাসা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অন্তরস্থল হইতে উঠিয়াছিল এবং সে জ্বালাময়ী পিপাসার নিবৃত্তির জন্য তিনি আকুল কণ্ঠে আমাদিগের নিকট চাহিয়াছিলেন "প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা।" আমরা তাঁহার সে দারুণ পিপাসা আজিও মিটাইতে পারি নাই, তাই সর্ব্বদা সেই হতাশকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি এবং কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না যে, রমাকান্ত রায় তাঁহার শেষ নিশ্বাসবিন্দু গ্রহণের সময় আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন "প্রতিহিংসা।"

পঞ্চম স্তবক।

নিঃস্বার্থ পরোপকারী রমাকান্ত রায়।

আমাদের বঙ্গদেশ সম্প্রতি একটি রত্ন হারাইয়াছে, চারিদিকে দেখি, মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সুখ লইয়া ভুলিয়া আছে। উদার, উন্নত ও মহৎহৃদয় মানুষ অতি বিরল। ইহার মধ্যে একজন যুবককে দেখিয়াছিলাম স্বার্থের মলিন ধূলি যাঁহার ললাট স্পর্শ করে নাই। তিনি পরলোকগত রমাকান্ত রায়। কিছুদিন হইতে যে দেশব্যাপী "স্বদেশী" আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতেই রমাকান্ত রায় জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ত্তমান আন্দোলনে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহৎহৃদয়ের সামান্য পরিচয় মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার মহত্ত্ব ইহার অনেক পূর্ব্বেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই মহৎ জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইল না। অকালে তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি এই তরুণ বয়সেই তাঁহার মহৎ চরিত্রের প্রভাব এই বঙ্গদেশের উপর এমন মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার জন্য আমরা সকল বাঙ্গালী তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দিয়াছি। রমাকান্তের এমন শক্তি কোথা হইতে আসিল? তিনি দরিদ্র ছিলেন, বিদ্যার খ্যাতিও তাঁহার অসামান্য ছিল না। তবে দেশের উপরে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা তিনি কিরূপে পাইলেন? ইহার উত্তর এই, এ জগতে আসিয়া কি খাইলাম কি পরিলাম, বা কতদিন থাকিলাম, ইহাতে জীবন নহে, কিন্তু জীবনের মহৎ আদর্শে সর্ব্বদা বাস করাই জীবন। এ পৃথিবীতে বড় পদ বা বেশী টাকা কড়ি কেহ পায়, কেহবা পায় না, সম্পদ ঐশ্বর্য্য সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি?

---

* "মুকুল" পত্রিকার ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবনের মহৎ লক্ষ্য দৃষ্টিপথে রাখিয়া যিনি তাহার সাধনায় প্রাণপণ যত্ন করেন, প্রকৃত সম্পদের উত্তরাধিকার তিনিই পাইয়াছেন ; তাঁহার সে ধন অক্ষয়, তাহা বিনাশ করিবার শক্তি কাহারো নাই। রমাকান্ত বিধাতার বরে এই দুর্লভ সৌভাগ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! পরদুঃখে বিগলিত মহাপ্রাণ তিনি পাইয়াছিলেন এবং জীবনের মহৎ আদর্শে তিনি অহরহ বাস করিতেন। জলন্ত ঈশ্বর প্রেম ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ের প্রতি শিরায় অহোরাত্র বিচরণ করিত। তাঁহার জীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহা জগতে অতি দুর্লভ। তাঁহার সেই সুঠাম সৌম্য দেহ যেমন সাধারণ যুবকদিগের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও উন্নত ছিল, তাঁহার মনও সেইরূপ সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সংসর্গে যাঁহারা তাঁহাকে জানিযাছিলেন তাঁহারা তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহাব স্বদেশপ্রেম দেখিয়া ভক্তি না করিযা থাকা যাইত না। তাহাতে তিলমাত্র কৃত্রিমতা বা মলিনতা ছিল না। তাহা খাঁটী সোনা ছিল। জন্মভূমি তাঁহার নিকট সত্যই জননীর মত পূজ্য, পবিত্র এবং ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র ছিল। জন্মভূমির দুঃখ দুর্গতি তাঁহার মহৎ হৃদয়ে বড় বাজিয়াছিল, দেশের দুঃখে তিনি সত্য সত্যই কাঁদিযাছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেম তাঁহার মহৎ হৃদযের সাধারণ প্রেমের বিশেষ বিকাশ মাত্র। যাহারা ভালবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় করুণ, তাহারা দুঃখী দেখিলে স্বদেশী বিদেশী বিচার করিতে পারে না। যেখানে সবল দুর্ব্বলকে অত্যাচার করিতেছে, যেখানে অন্যায মস্তকোত্তোলন করে, যেখানে দুঃখী দরিদ্র নিরাশ্রয়ের হাহাকার ধ্বনি, তাহারা ব্যাকুল হইয়া সেখানেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে। রমাকান্ত রায় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। আশৈশব তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই, যে যেখানে দুঃখীর দুঃখ, সেখানেই রমাকান্ত রায়।

রমাকান্ত রায়ের ভালবাসা স্বদেশ বিদেশ জানিত না। এরূপ হৃদয় যে স্বদেশের দুঃখে কাঁদিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আমরা রমাকান্ত রায়ের স্বদেশপ্রেম দেখিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালীর গৌরব মনে করিয়াছি। বাস্তবিক তিনি আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক। আবার অপর দিকে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশ্বপ্রজা বলিতেন; তিনি এই নাম বড় ভালবাসিতেন।

আপন আর পর এই ভেদজ্ঞান রমাকান্ত রায়ের নিকটে যেমন মুছিয়া গিয়াছিল, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি কিনা তাহা জানি না। তাঁহার জিনিসে, তাঁহার অর্থে তাঁহার বন্ধুগণের সমান অধিকার ছিল। তাঁহার গৃহের দ্বার তাহাদের জন্য সর্ব্বদাই অবারিত থাকিত। যতক্ষণ হাতে একটি মাত্র পয়সা আছে, ততক্ষণ তাঁহার কোনও বন্ধুর অভাব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি, জাপানে অবস্থিতি কালে তাঁহার এক বন্ধু আমেরিকা যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু হাতে সম্পূর্ণ টাকা নাই। রমাকান্ত রায়েরও বেশী অর্থের সংস্থান ছিল না। তাঁহার হাতে তখন পাঁচশত টাকা মাত্র ছিল। সুদূর বিদেশে তাহা কিছুই নহে, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তিনি নিজের ভাবনা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধুকে দিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আড়াইশত টাকা বেতনের একটি চাকরী পাইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিদ্যাশিক্ষার্থ আমেরিকা যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়া তাঁহাদিগকে আমেরিকা পাঠাইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি নিজে তাঁহাদের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আপনার বেতনের মধ্য হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা নিজের জন্য রাখিয়া বাকী দুইশত টাকা তাঁহাদিগকে দিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। আপন ভাইয়ের জন্যও লোকে এমন করে কিনা সন্দেহ। তাঁহার উদার হৃদয়ে স্বার্থের চিন্তা বুঝি কখনও স্থান পায় নাই।

রমাকান্ত রায়কে দেখিলে শিখ যুবক বলিয়া ভ্রম হইত। উন্নত দেহ, বিশাল ললাট, সুদীর্ঘ বাহু, যেন বীরত্বের মূর্ত্তি। যেমন দেহ তেমনি মন। ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা কাহাকে বলে, রমাকান্ত তাহা জানিতেন না। সকল সঙ্কটের স্থলে তিনি সর্ব্বাগ্রে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বিপদ দেখিয়া কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। আত্ম সম্মান জ্ঞানে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্ব্বিত লোকের নিকটে কোনও দিন মস্তক অবনত করেন নাই। অপর দিকে আবার কি বিনয়! যেখানে সাধুতা, সত্যানুরাগ, চরিত্রের পবিত্রতা দেখিতেন, তাঁহার সম্মুখে রমাকান্ত রায় ভক্তিভরে অবনত হইতেন। বিনয় তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক ভূষণ ছিল। তাহাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। সংসারের কোনও কুটিলতা তাঁহার শিশুর মত সরল প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হায় বঙ্গদেশ কি রত্নই হারাইয়াছে? এমন জীবনের কাহিনী শুনিলেও মন উন্নত হয়। সংক্ষেপে আমরা তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছি।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে ১৮৭৩ খৃঃঅব্দে রমাকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালী কিশোর রায় সেই অঞ্চলের একজন সুবিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুল হইতেই সেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হওযাতে পিতৃব্য মথুরচন্দ্র রায়ের উপর তাঁহাদের পাঁচ ভ্রাতার লালন পালনের ভার পতিত হয়। রমাকান্ত রায়ের মাতুল বংশের অনেকেই শ্রীহট্ট হইতে পদব্রজে পুরী ও নৌকা করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থধামে যাইতেন। এই সকল স্থানেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঘন ঘন তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দেশ ও লোক সম্বন্ধে গুরুজনদিগের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, রমাকান্ত তাঁহাদের মুখে মুখে গল্প শুনিয়া সেই সকল সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান উত্তর জীবনে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল।

রমাকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন। যখন কেহ জাপান যাইবার কল্পনাও করে নাই, তখন তিনি খনিবিদ্যা শিখিতে জাপান যাত্রা করেন। আজকাল রুশ জাপান যুদ্ধের জন্য আমরা জাপানের অনেক বিষয় জানিযাছি। এখন জাপান যেন আমাদের এই দেশেরই কোন এক স্থানে, আমাদের একপ মনে হয়, কিন্তু রমাকান্ত যখন জাপান যাত্রা করেন, তখন সেখানকার কথা আমাদেব দেশের প্রায় কেহই জানিতেন না। এ বিষযে তিনি বঙ্গীয় যুবকদের নিকটে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইযাছিলেন। তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া এখন অনেক বাঙ্গালী যুবক শিক্ষা লাভ করিতে জাপানে যাইতেছেন। রমাকান্ত জাপানে যাইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞানানুরাগ, সর্ব্বোপরি গভীর দেশানুরাগেব জন্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিযাছিলেন। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ-গোলক যেমন যে নিকটে আসে, তাহাকেই উত্তপ্ত করে, তেমনি রমাকান্ত যাহারই নিকটে আসিতেন, তাহাকেই জ্বলন্ত ভাবের তাপে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার জাপান অবস্থান সময়ে বোম্বাই অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রমাকান্ত মাতৃভূমির ব্যথায় অন্তরে দারুণ বেদনা লইযা সজল নয়নে জাপানের দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা কবিতে বাহির হইলেন এবং দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ তথা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইযা দিলেন।

জাপানে যে খনিতে কাজ করিতেন, তথাকার শ্রমজীবীগণেব স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলের সঙ্গে রমাকান্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিযা মিশিতেন। তাহাদের সুখ দুঃখ তিনি আপনাব বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহাদের বালক বালিকাদিগের শিক্ষার উপায় করিয়া দিতেন। তাহাদের কলহ বিবাদ মাঝে পড়িযা মিটাইয়া দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে উচ্চ ও মহৎ ভাব সকল প্রচার করিতেন। কেবল তাহাই নহে, খনির মধ্যে কাজ করিতে করিতে আকস্মিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে।

এই সকল দুর্ঘটনায় যাহাদের মৃত্যু হয় বা যাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তিনি তাহাদের পরিবারের সাহায্যের জন্য তথায় এক সংস্থান-ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। বংশ পরম্পরায় কত হতভাগ্য শ্রমজীবী তাহা হইতে সাহায্য পাইবে। এই সকল কারণে খনির শ্রমজীবী লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বলিয়া অকুণ্ঠিত বিশ্বাসভরে তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিল। টোকিও সহরে যখন তিনি রাজপথে বাহির হইতেন, তখন দরিদ্র বালক বালিকারা আনন্দে দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইত; তিনি খেলনা, ছবি, মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি দিয়া তাহাদের হৃদয় কিনিয়াছিলেন। বিধবা, অনাথ পরিত্যক্ত, উপায়হীন পথিক, সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত দরিদ্র, যাহাদের দুঃখের সংবাদ লইবার সংসারে কেহ নাই তিনি সুখে দুঃখে তাহাদের সহায়, সেবক, অন্ন ও উৎসাহদাতা সকলই ছিলেন। লোকের দৃষ্টির পশ্চাতে আপনাকে সযত্নে লুকাইয়া তিনি অকাতরে ইহাদের সাহায্য করিতেন। যেখানে যখন যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ও শান্তি তথায় গিয়া আবির্ভূত হইত। স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার পার্শ্বে এক বৃহৎ পরিবার লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান ছিল, ইহাদের চিন্তা ও শ্রমভার বহন করিয়া তিনি অপার তৃপ্তি লাভ করেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া রমাকান্ত কাশ্মীরে এক চাকুরী পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথায় বেশী দিন থাকেন নাই। কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া একবন্ধু তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ছিলেন, রমাকান্ত কলিকাতাস্থ তাঁহার এক বন্ধুকে বলিলেন "আমি আর কাশ্মীর যাইবনা, আমি স্বদেশের সেবায় সমুদয় শক্তি দিব স্থির করিয়াছি।"

রমাকান্তের কাশ্মীর হইতে আগমনের কিছুদিন পরেই বঙ্গদেশে বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল। শরীর মনের সকল

সামর্থ্য ও শক্তি লইয়া রমাকান্ত মহোৎসাহে ইহাতে প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যে কি দুরন্ত শ্রম করিতেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বদেশের প্রতি অনন্ত অনুরাগ তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিল। বক্তৃতা প্রদান, জাতীয় সংকীর্ত্তনের গায়কদল গঠন, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচার এই সকল কার্য্যে তিনি আহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। বার্ণ কোম্পানীর তিনশত কেরাণী ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিলে রমাকান্ত তাঁহাদের বিপন্ন পরিবারের জন্ত অর্থ ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। জাতীয় ভাণ্ডারের ভিক্ষা ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ, হাটে কাপড় কিনিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী স্বয়ং চাহিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতমূল্যে তাহা বিক্রয় ইত্যাদি কোন কর্ম্মেই তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনে আপনি যেমন প্রাণমন অর্পণ করিয়াছিলেন স্বদেশীয় সকলকে সেইরূপ এই ব্রতে দীক্ষিত করিতে তিনি কোন শ্রম তুচ্ছজ্ঞান করেন নাই। তাঁহার এই আত্মবিস্মৃত অবিরাম শ্রমের গুণে আমাদের দেশে সম্প্রতি এমন এক দল যুবক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা অকুণ্ঠ সাহস ও অসীম ধৈর্য্য সহকারে দেশের জন্ত সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রমাকান্ত এই যুবকদলের নেতা ছিলেন; তাঁহারা যখন কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন বা নিরাশায় আচ্ছন্ন হইতেন, তখন তিনি উৎসাহ বাক্যে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন। জীবন না দিলে জীবন উৎপন্ন হয়না। রমাকান্তের অক্ষুন্ন আত্মত্যাগের গুণে বঙ্গভূমি তাঁহার সেবক এই সন্তান দল পাইয়াছেন। বঙ্গমাতার অক্ষয় আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহার এই সুসন্তান স্বর্গে গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ স্তবক।

মাতৃভক্ত ও নারীহিতৈষী

রমাকান্ত রায়*

প্রায় ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৩ বোধ হয়) ৺রমাকান্ত রায় জাপান হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে শ্রীহট্টে আমাদের বাসায় আসিয়া অতি হন। আমার ছোট মেয়ে-ছেলেরা শুনিয়াছিল, যে আমাদের বাড়ীতে জাপান হইতে একটী ভদ্রলোক আসিবেন, তাহারা জাপানীদের ছবিতে যেরূপ চেহারা দেখিয়াছিল, তাহাদের সেরূপই ধারণা ছিল। তখন শ্রীহট্টে রেল হয় নাই কুলাউরা ষ্টেশন হইতে নৌকায় আসিতে হইত। তিনি রাত্রিতে নৌকায় আসিলেন। পরদিন প্রাতে উঠিয়া আমার ছোট মেয়েটী জাপানী মানুষ দেখিবার জন্য উৎসুক হইল। রমাকান্ত তাঁহার জাপানী ছিটের কীমনো পরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সে তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ এবং হাসিভরা মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল, "এতো জাপানী মানুষ নয়, "একজন বাবু!" রমাকান্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাপানী ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে নানাকৌতুকজনক গল্প বলিয়া আমার ছেলেমেয়েদের এত বশ করিয়া নিলেন, যে তারা আর তাঁকে যাইতে দিতে চাহিত না। কি সরল, প্রফুল্ল চেহারা এবং কর্ম্ম পটু মানুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত দুদণ্ড আলাপ করিলেই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও পবিত্রতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হইত। নারী জাতির প্রতি কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল! আমার সহিত অবসর পাইলেই (রান্না ঘরে বসিয়া) কি করিয়া আমাদের দেশের নারী জাতিকে জাগান যায়, কি করিলে আমাদের মেয়েরা জাপানী মেয়েদের মত কর্ম্মে সুচতুর ও শিল্প নিপুণা হইবে এবং

---

* শ্রীযুক্তা হেমন্ত কুমারী চৌধুরী মহাশয়ার লিখিত।

মেয়েদের অবরোধ প্রথা নিবারণের জন্য কি করা যায়, ইত্যাদি অনেক বিষয় আলাপ করিতেন।

তিনি শ্রীহট্টের টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন, ব্রাহ্ম সমাজে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহাকে আমাদের গৃহে অতিথি হইতে দেখিয়া তাঁহার হিন্দু আত্মীয়েরা বড় মনঃক্ষুন্ন হইলেন। যাহোক্, কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আমাদের পরিবারের সকলের আপনার লোক হইলেন। তাঁর খুব আগ্রহ ছিল যে আমি আমার একটী মেয়েকে জাপানে শিল্প শিক্ষার্থ পাঠাই। এবং তিনি স্বয়ং তাহার ব্যয়বহন করিতে উদ্যত ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে কয়েক দিন বাস করিয়া তাঁহার জাপান-প্রবাসের কথা সকলকে শুনাইয়া যুবকদিগকে বিদেশে ও জাপানে শিক্ষার্থ যাইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জাপানীদের কর্ম্মপটুতা ও দেশভক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় গিয়া সেখানে দেশের যুবকদের দেশ সেবার জন্য নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বঙ্গচ্ছেদের সময় দেখিতে পাই। দেশী মোটা কাপড়ের মোট ঘাড়ে নিয়া রাস্তায় ফেরী করিতে দেখিয়া অনেক যুবকবৃন্দ তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" ইত্যাদি প্রাণমাতান গান গাহিয়া তাঁহারা পাড়ায়, পাড়ায় দেশী কাপড় বিক্রী করিতেন। আমি যখন ১৯০৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে বেনারস কংগ্রেস এবং থিস্ওফি কন্ফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে দুইদিন কলিকাতায় ছিলাম, তখন একদিন রাত্রিতে রমাকান্ত আসিয়া আমাকে ধরিলেন, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পরদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে বক্তৃতা দিতে হইবে। আমি এইরূপ দুরূহ কার্য্যের জন্য কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ পরদিনই আমার ভোরের ট্রেনে শ্রীহট্ট রওনা হইবার কথা ছিল। আমি নিজের

অনুপযুক্ততা ভাবিয়া আরও রাজী হইতে পারি নাই। কিন্তু তিনিও ছাড়িবেন না। সেই রাত্রিতে গিয়া Bengalee কাগজে Notice দিয়া আসিলেন যে, "আমি বক্তৃতা দিব," কি করি অগত্যা বাধ্য হইয়া (আমার দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়া) আমি সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে বেদীর চতুর্দ্দিকে আমার গুরুজন ধর্ম্মোপদেষ্টা পিতৃস্থানীয় প্রচারকমণ্ডলীকে দেখিয়া আমি নিজের অযোগ্যতা এবং ধৃষ্টতা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। আমাকে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া উৎসাহ দিয়া বক্তৃতার জন্য দাঁড় করাইলেন। সকলের আশীর্ব্বাদে এবং ব্রহ্মকৃপাবলে যেমন বোবার মুখে কথা ফুটে সেইরূপে আমিও অনর্গল ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়াছিলাম। মন্দিরে লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি তাহার পূর্ব্বে শিলংএ, শ্রীহট্টে এবং পশ্চিমে কোন কোন স্থানে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, কিন্তু কলিকাতায় আমার সাহস ছিল না। কেবল রমাকান্ত রায়ের আগ্রহেই আমাকে এরূপ অসম্ভব কার্য্যে দাঁড়াইতে হইল। তিনি আমাকে সারাদিন কত দোকানে, কত স্থানে লইয়া গিয়া স্বদেশী নানাবিধ বস্ত্র ও কল ইত্যাদি দেখাইলেন, দেশভক্ত ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

যাহোক তাঁহার মত উৎসাহী যুবক যে নারীজাতির মধ্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিতে পারেন ইহা আমার বিশ্বাস হইল। এই সকল ঘটনার পরে তিনি উত্তর পশ্চিমে চাকুরীর জন্য যাত্রা করিলেন। কাশ্মীর হইতে আমাকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। সকল গুলির মধ্যেই তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা এবং দেশ-সেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পাইত। তাঁহার পত্র পাঠে আমার প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ হইত। কি জীবন্ত মানুষ ছিলেন! ভগবান তাঁহাকে আরও কয়েক বৎসর বাঁচাইয়া রাখিলে তিনি

দেশের জন্য আরও কত কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি অতি সাদাসিধে লোক ছিলেন, কোনও আড়ম্বর বা বাবুগিরী ছিল না। কেবল দুঃখ করিয়া বলিতেন—"আপনারা সংক্ষেপে কেন রান্না বান্নার কাজ সারিয়া সমাজের ও দেশের কাজে সময় দেন না? আপানাদের নিজেদের ঘরকন্নার বাহিরেও তো সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আছে!" এদেশের মেয়েদের পরাধীনতা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। দেশের মেয়েদের ও যুবকদের মধ্যে জাগৃতি আনিবার জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে অকালে এরূপ বীর সন্তানকে হারাইতে হইল। তিনি যদিও তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালে চলিয়া গেলেন, কিন্তু যে গভীর দেশভক্তির ছাপ বঙ্গীয় যুবকদের প্রাণে দিয়া গেলেন তাহার সুফলস্বরূপ অনেক যুবকই দেশের জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগী হইলেন।

রমাকান্তের মত সুদীর্ঘ বিশালদেহ এবং চিরপ্রসন্নমুখ লোক প্রায় দেখা যায় না। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমাদের পরিবারে সকলেরই গভীর দুঃখ হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার ভক্ত সুপুত্রকে তুলিয়া নিয়া তাঁর চির আনন্দধামে আশ্রয় দিয়াছেন। তাঁর আত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাণে তাঁর পবিত্র স্মৃতি কখনও লুপ্ত হইবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সপ্তম স্তবক

বঙ্গবিভাগ ও রমাকান্ত রায়।*

রমাকান্ত বাবুকে চিনি তিনি জাপান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর। তৎপূর্ব্বে তাঁর ভ্রাতা স্বর্গীয় শ্রীকান্ত বাবুকে জানিতাম, তিনি রাজা রাম মোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমাকান্ত বাবু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম জাপানে অধ্যয়নেব জন্য গমন করেন এবং খনিজ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এম্ ই উপাধি লাভ করেন। তিনি জাপান-গামী ছাত্রদের পথ-প্রদর্শক। জাপান এশিয়ার মধ্যে উন্নতিশীল দেশ এবং পূর্ব্ব হইতে তাঁর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল; কবি-বর্ণিত "অসভ্য জাপান" পদবী অতিক্রম করিয়া জাপান "উদয়োন্মুখ সূর্য্যের দেশ" এই উপাধি লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধে রুশিয়ার মত প্রবল শক্তিশালী জাতিকে পরাজিত করিয়া জাপান গৌরবের উচ্চ চূড়াতে অধিরোহণ করিয়াছিল। জাপান ইউরোপ হইতে নিকটতর; আমাদের দেশের ধর্ম্ম সেই দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল; জাপানের খরচ কম; সে দেশের লোক আমাদের ন্যায় অন্নভোজী। সেখানে যে সব শিল্পশিক্ষা করা যায়, তাহার কারখানা অল্পমূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে। রমাকান্তবাবুর জাপান হইতে কৃতকার্য্য হইয়া আগমনে এই সকল বিষয়ে দেশের ছাত্রবর্গের দৃষ্টি পড়িল এবং অনেক ছাত্র জাপানে শিক্ষার জন্য গমন করিতে লাগিল। কি জানি কেন, এখন সে স্রোতে যেন একটু ভাঁটা পড়িয়াছে।

রমাকান্ত বাবু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন কি তার অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে বঙ্গবিভাগের ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন সমগ্র বঙ্গবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, বঙ্গবাসীর মর্ম্মন্তুদ বেদনার প্রতি একটুও সহানুভূতি না

*৺ললিত মোহন দাস মহাশয় লিখিত

দেখাইয়া, বঙ্গ-মাতাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিগণ দুই বঙ্গের অধিবাসী হওয়াতে তাহাদের সমবেত শক্তির হানি হইবে এই আশঙ্কা করিয়া বঙ্গবাসিগণ দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গকে একীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। লর্ড কার্জ্জন ইতি পূর্ব্বেই সেনেটের উপাধি বিতরণ সভায় বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এবং ভারতবাসীর প্রতিবাদ সত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া, কলিকাতা কর্পোরেশনেব নির্ব্বাচিত সভ্যগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া, লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগজনিত মর্ম্মবেদনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বঙ্গবাসীগন আবেদন নিবেদন পরিত্যাগ করিলেন এবং ব্রিটিশ বণিকদিগকে জব্দ করিবার জন্য স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনে দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। এই সময রমাকান্ত বাবু আসিয়া এই আন্দোলনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত, প্রকাণ্ড পাগড়ী মস্তকে তিনি যখন রাস্তা দিয়া চলিতেন—যেন কোন ভয় নাই, আশঙ্কা নাই, পরাজয়ের কোনও চিহ্ন নাই—তখন লোক তাঁর দিকে তাকাইয়া থাকিত। আমিও ঐ আন্দোলনের সময়ে দেশ-পূজ্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের ও ভক্তিভাজন কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভক্তিভাজন অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে সিটিকলেজের কাজে থাকিয়া সামান্য ভাবে এই আন্দোলনে কার্য্য করিতেছিলাম। এবং সেই জন্যই পরে আমাকে গভর্নমেণ্টের আদেশে কলেজেব সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই দেশের কার্য্যের সংশ্রবেই রমাকান্ত বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন; সুতবাং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও কার্য্যেও তাঁর সহিত সাহচর্য্য ছিল। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

যুবকগণ একদল তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল। তিনিও সুরেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণকুমারের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতেন।

মানিকতলা ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি থাকিতেন, নিঃসম্পর্কিত দেশ-সেবার্থী কোন কোন যুবকও সেখানে থাকিত। অনেকে সেখানে যাইয়া তাঁর উপদেশ গ্রহণ করিত। প্রায়ই দেখিতাম রমাকান্ত বাবু যুবকদের লইয়া মিছিল করিয়া চলিয়াছেন। এই সময়ে বার্ড কোম্পানী কি বার্ণ কোম্পানীতে কেরাণীগণ ধর্ম্মঘট করেন। ঐ কোম্পানী হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, স্থায়ী কর্ম্মের জন্য (Permanent Situations) পাঁচ শত লোক চাই। এর প্রতিবাদ করিয়া কলেজ স্কোয়ারে সভা হইল। তখন রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান ছিল কলেজ স্কোয়ারে। বোধ হয় সাতটা মঞ্চ হইতে বক্তৃতা করা হইয়াছিল। রমাকান্ত বাবু ঐ স্থায়ী কর্ম্মের প্রলোভন উল্লেখ করিয়া আবেগের সহিত প্রত্যেক মঞ্চ হইতে বক্তৃতা করিলেন এবং কোনও ভারতবাসী এই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ না করে, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

প্রায় প্রতি শনিবার তিনি ও আমি কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা করিতাম। আন্দোলনের সকল কাজের ভিতরই তিনি ছিলেন; আন্দোলন যত শীঘ্র শেষ হইবে, বঙ্গবিভাগ রহিত হইবে মনে করা গিয়াছিল—তাহা হইল না; ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর (৩০ শে আশ্বিন) বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সার্কুলার রোডে প্রস্তাবিত ফেডারেশন হলের জমিতে বিরাট সভা হইল। মৃত্যু-শয্যা হইতে আরাম কেদারায় বাহিত হইয়া দেশ-পূজ্য ঋষিকল্প আনন্দমোহন সেই সভায় উদ্বোধন কার্য্য করিলেন। গবর্ণমেণ্টের বঙ্গবিভাগ সত্ত্বেও আমরা বাঙ্গালী একত্রিত থাকিব, এই ঘোষণা পাঠ করা হইল এবং স্বদেশী মন্ত্র দৃঢ় করা হইল।

সেই দিনই পশুপতিবসু মহাশয়ের বাড়ীতে জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইল।

রমাকান্ত কয়েক মাস পরে কার্য্য লইয়া ঝরিয়া কি ঐরূপ কোন স্থানে যান। অর্থের তাঁর প্রয়োজন ছিল। আর তাঁর সংকল্প ছিল, যুবকদিগকে শিল্প শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠাইতে হইবে। আমেরিকায় একটা সুবিধা এই ছিল যে সেখানকার যাবার পাথের ও প্রত্যেকে নগদ আড়াই-শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে আমেরিকায় যাইতে পারিত। সেখানে নিজে উপার্জ্জন করিয়া পড়াশুনা করিতে পারিত। দেশকে শিল্পে বানিজ্যে উন্নত করিতে হইলে, স্বদেশীকে স্থায়ী করিতে হইলে বিদেশ হইতে শিল্প বানিজ্য শিক্ষা করিয়া আসা প্রয়োজন। ১৯০৬ সালের গুডফ্রাইডের সময় বরিশালে মিঃ আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলন হয়। লাট ফুলারের গভর্ণমেণ্ট প্রোসেসন ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করার জন্য য়্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির মেম্বারদিগকে প্রহার করেন, দেশমান্য সুরেন্দ্র-নাথকে গ্রেপ্তার করেন ও পরদিন সভা ভাঙ্গিয়া দেন। সেই সম্মেলনে রমাকান্ত বাবু বোধ হয় যাইতে পারেন নাই। তারপর কয়েকটি যুবককে তিনি আমেরিকায় প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি জানিতাম—আমার পরম স্নেহ-ভাজন প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধুবড়ীর বীরেন্দ্র নাথ সেন, ঢাকার বীরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত, ও হেরম্ব চন্দ্র দাস গুপ্ত; এর মধ্যে বীরেন্দ্র গুপ্ত অভিভাবকগণকে না জানাইয়া চলিয়া যান। ইহাদের মধ্যে তিনজন (ধীরেন সেন ব্যতীত অপর তিনজনই) আমার ৮২।১ হ্যারিশন রোডের বাসাতে এক সময় ছিল। বীরেন গুপ্ত ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে টাটা কম্পানীতে, পরে বেহার গভর্ণমেণ্টে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। হেরম্ব একবার আসিয়া আবার চলিয়া যায়। হেরম্ব ও বীরেন সেন এখন কোথায় আছে জানি না; প্রফুল্ল আমেরিকায়

আছে। ভারতবর্ষে আসা তারপক্ষে বারণ। এরা পৌছিবার পূর্ব্বেই রমাকান্ত বাবু টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। দেশের উন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই অল্প কালেই তাঁর শেষ হইল। তিনি একজন প্রকৃত মানুষ ছিলেন, দেশের জন্য ঈশ্বরের নামে আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। তাঁর একদিকে ঈশ্বর-ভক্তি, গুরুজন-ভক্তি, বিনয় অসাধারণ ছিল, অপরদিকে দেশ-প্রীতি এবং সেই প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অকুতোভয়ে কঠোর সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া, সকল দুঃখ লাঞ্ছনা বরণ করা—তাঁর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

রমাকান্ত বাবুকে অল্প বয়সেই ইহ লোক হইতে চলিয়া যাইতে হইল। বর্ত্তমান সময়ের লোকে তাঁহার নামও অনেকে জানেনা। আজ তিনি জীবিত থাকিলে, দেশকার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, এবং দেশের নরনারীগণ যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইতেন। নিশ্চয় পরলোক হইতে তিনি দেশের অবস্থা দেখিতেছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

অষ্টম স্তবক

জাপান-প্রত্যাগত ও স্বদেশী কাপড়ের ফেরিওয়ালা রমাকান্ত রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে প্রাচ্য জাপান যখন ইয়ুরোপীয় রুষ দৈত্যকে (Collosus) পরাজয় করিয়া পোর্ট আর্থার দখল করিল, তখন ভারতীয় তরুণদল নব আশায় বলীয়ান্ হইল, প্রাচ্য জাতিরও বলীয়ান্ হওয়ার আশা আছে। পোর্ট আর্থার, এড্‌মিরেল টগোর নাম তখন মুখে মুখে। বাপ মা নবজাতদের নামাকরণ করিলেন 'টগো'। জাপান তখন ভারতীয় যুবকের আদর্শ। ওকাকুরার জাপানী সভ্যতা সম্বন্ধে পুথিখানা যুবকরা কণ্ঠস্থ করিল। কয়েকটী অগ্রগামী (Pioneer) জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের জন্য পশ্চিমে না গিয়া পূর্ব্বদিকে অজানা তীর্থের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দিলেন। ৺রমাকান্ত রায় এই দলের অগ্রণী।

কলিকাতার ছাত্র মেছে আমরা যখন শুনিলাম শ্রীহট্টেরই সন্তান খনিজ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন তখন বিপুল উৎসাহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জলসুকার রায় পরিবারের সহিত আমাদের বহু কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তজ্জন্য অতিরিক্ত একটী টানও ছিল। তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। প্রতিভা প্রথম দর্শনেই প্রভাব বিস্তার করে। শালপ্রাংশু, মহাভুজ, সবল মৃদু হাসি, দৃষ্টি আত্মভোলা। জাপানী রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, পড়ার ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ক নানান কুতূহলী প্রশ্নের সংক্ষেপে সরল ভাষায় তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন।

সাবধান হইলে জাপানে মাসিক ৪০৲ ব্যয়ে পড়াশুনা চলে (তৎকালীন কলিকাতার ব্যয় ২০৲ ২৫৲) শুনিয়া অনেকে উৎসাহী হইল। জাপানীর স্বদেশ-প্রেমিকতা, সম্পূর্ণ দেশাত্মবোধ, সামুরাই ধর্ম্ম—দেশের জন্য সম্রাটের জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত—দুইচারিটী কথায় জাপানের উজ্জ্বল ছবি আমা-

দের চক্ষে প্রতিভাত হইল। বুঝিলাম আমাদের রমাকান্তও সামুরাই মন্ত্রে দীক্ষিত, দেশের জন্ম উৎসর্গীকৃত।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দেব, ৺গগন চন্দ্র সেন ডি, এস, পি প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র-বন্ধু স্থির করিলাম তাঁহাকে বৃহত্তী সভায় অভিনন্দন জানাইতে হইবে, আমরা এলবার্ট হলের ট্রাষ্টী, 'ইণ্ডিয়ার মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্র চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ী গিয়া বিনাভাড়ায় হল সংগ্রহ করি, ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি নেতৃগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া সভায় উপস্থিতির জন্ম নিমন্ত্রণ করি। গান্ধীজী এই সময় একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আবিষ্কর্ত্তা এবং নেতা হিসাবে তাঁহার নাম ইতি মধ্যেই ভারতে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক কাহাকেও দিয়া মান-পত্র লিখাইতে না পারিয়া বন্ধুবর সুরেশ চন্দ্র দেব সহযোগে সংক্ষিপ্ত ইংরেজী একখানা মানপত্র রচনা করি। প্রাণের আবেগে লিখিয়াছিলাম, তজ্জন্ম under-graduate এর রচনা হইলেও হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয় সভাপতি ছিলেন কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্টীয়াদের কাণ্ডারী শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়। হলটী দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল, প্রধান বক্তাগণ ছিলেন, বাগ্মী নেতা সুরেন্দ্র নাথ, মহামতি গোখলে এবং (তখনকার) মিঃ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। জাপানের আত্মত্যাগ, আমাদের আদর্শ আশাভরসা, রমাকান্তের মতন অগ্রগামী সৈনিকগণ আমাদের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিবে। বাগ্মীরা জ্বালাময়ী ভাষায় যুবকদের প্রেরণা দিলেন। এখন এরূপ বাগ্মী দেখা যায় না, তখন দরকার ছিল, এখন বোধ হয় দরকার নাই। কাজের সময়। সেইরূপ বাগ্মীতা এখন আর নাই, বোধহয় পৃথিবীর কোথাও নাই। যাহাকে মানপত্র দিবার জন্ম সভার আয়োজন তিনি অতি বিনয়ের সহিত

লাজুকভাবে দুই একটী কথায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এরপর রমাকান্ত মাইনিং এঞ্জিনিয়ারের কাজে যান। আশা করিলাম তাহার চেষ্টায় খনিজ সম্পত্তিতে দেশ সমৃদ্ধ হইবে। হঠাৎ দেখি "মায়ের ডাকে" রমাকান্ত কলিকাতার রাস্তায় অলিতে গলিতে, সেই শালপ্রাংশু দেহ—পায়ে স্যাণ্ডেল (তখনও স্যাণ্ডেলের প্রচলন হয়নি)—পরণে চীনা ফেরিওয়ালাদের মত ঢিলা পায়জামা কুর্ত্তি, নীলরংয়ের নহে, ডোরাকাটা স্বদেশী কাপড়ের) পৃষ্ঠে প্রায় মন খানেক ওজনের প্রকাণ্ড কাপড়ের গাঠ, স্বদেশী কাপড় ফেরি করিয়া ঘুরিতেছেন। রাস্তার লোক অবাক্ হইয়া দেখিত, এই ফেরিওয়ালাত চীনেম্যান নয়, কাবুলীও নয়, এ যে বাঙ্গালীবাবু। কয়েকদিন মধ্যেই তিনি এই বিশাল নগরীর সকলেরই পরিচিত হইলেন। এহেন দৃশ্যের নূতনত্ব কাটাইবার পরও দেখিয়াছি, বহুলোক এই মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া স্বল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া মৌন অভিবাদন জানাইয়াছেন। "বন্দেমাতরম্" সম্প্রদায়ের "মায়ের দেয়া মোটা কাপড়, তোরা মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে তেদের, এর বেশী তাঁর সাধ্য নাই" প্রভৃতি গানে তখন কলিকাতা নগরী সহর, বাংলার পল্লীর হাট বাট মুখরিত! অদ্ধ শতাব্দী পরে আজও মা সেই "দীন দুঃখিনী"! বাংলার কলে বহু কাপড় প্রস্তুত হয়, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা আজ লক্ষ, কোটিতে টাকা গুণে, কিন্তু স্বদেশী যুগের আনন্দ উৎসাহ কই? রমাকান্তের মত লোহার কাত্তিকও অক্লান্ত অনবসর পরিশ্রমে, রৌদ্র বৃষ্টি তাপে স্নানাহারের অনিয়মে অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্রীভূমির এই পাগলা ছেলেটি হয়ত ভাবিয়াছিল—Art is long but time is fleeting. ৺রমাকান্তের মত ব্যক্তিকে বর্ণনা দিয়া পাঠকের সহিত পরিচিত করাইবার চেষ্টা বৃথা, চাক্ষুষ না দেখিলে এ সব লোক চিনিতে পারা যায়না। সত্যিকার মানুষের পুণ্য স্মৃতি এই প্রবন্ধে অনুসরণের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিলাম।

শ্রীহট্ট (স্বাক্ষর) শ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী

৯ই আশ্বিন ১৩৫৪ সাল

নবম স্তবক

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ শহিদ রমাকান্ত।

শ্রীহট্ট-গৌরব পরলোকগত রমাকান্ত রায় ছিলেন দেশমাতৃকার কৃতী সন্তান। বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায় তাঁহার খবর রাখেন কিনা জানি না। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় আজ আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। অন্ততঃ পক্ষে প্রতিবর্ষে স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা করা শ্রীহট্টবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ পৃথিবীতে এমন কয়েক জন অসাধারণ শক্তিশালী মানবকে প্রেরণ করেন, যাঁহাদিগকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলিয়া থাকি. "ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।" ভগবন্নির্দ্দিষ্ট মহৎ কার্য্য সাধনান্তর তাঁহারা জগত-পিতার শ্রীচরণে আবার আশ্রয় নিতে চলিয়া যান। সাধারণ মানবের চক্ষে রমাকান্ত ছিলেন "ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।" স্বল্পায়ু হইয়াও যে সকল মহৎ কার্য্য তিনি সাধন করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াও অনেকে তাহা করিতে পারেন না।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রমাকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালী কিশোর রায়। বাল্যকালে রমাকান্তের পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায় পিতৃব্য মথুরচন্দ্র রায়ের উপর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রমাকান্ত শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতে যান। বাল্যকাল হইতেই বিদেশে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হয়। তিনি ছিলেন ডান্‌পিটে ছেলে। জীবনে ভয় বলিয়া কোনও বস্তু আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি ছিলেন দুর্জ্জয় সাহসের জলন্ত প্রতীক্। এফ্-এ ক্লাসে পড়ার সময় হঠাৎ একদিন খনিবিদ্যা শিখিবার জন্য তিনি জাপান রওনা হইয়া যান। তাহার পূর্ব্বে

আর কোনও বাঙালী জাপানে যাইতে সাহস করেন নাই। এখনকার মত সেই সময়ে বিদেশ-যাত্রার এত সুবিধাও ছিল না। রমাকান্ত জাপানে থাকা কালে বোম্বে নগরীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জননী জন্মভূমির দুর্দশার কথা শুনিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রু-সজল নেত্রে আর্দ্র-কণ্ঠে দেশের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়া জাপানের দ্বারে দ্বারে তিনি অর্থ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষাধিক মুদ্রা তিনি একা সংগ্রহ করিয়া ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একজন ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে বিদেশ হইতে এত টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রেরণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু স্বীয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সদ্‌গুণাবলীদ্বারা রমাকান্ত জাপানবাসীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই অসম্ভবকে বাস্তবে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, রমাকান্ত দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জাপানের খনির অসংখ্য শ্রমজীবী উপায়হীন বিধবা, দরিদ্র জনসাধারণ ও বালক-বালিকার দল অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল। তিনি যে ছিলেন তাহাদের দরদী বন্ধু, অকৃত্রিম সুহৃৎ। জাপান বাসকালে তিনি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ মমতাদ্বারা তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। জাপান হইতে খনিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রমাকান্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। কাশ্মীরে এক চাকুরী পাইয়া তিনি তথায় চলিয়া যান। বঙ্গদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসিয়াছে। স্বদেশের প্রতি যাঁহার জলন্ত অনুরাগ, তিনি কি তখন চাকুরীর মোহে প্রলুব্ধ থাকিতে পারেন? রমাকান্ত স্বদেশের সেবায় তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমে ভাঁজ ছিল না, প্রাণ দিয়া দেশকে তিনি ভালবাসিতেন। পরাধীনা দেশমাতৃকার বেদীতে অকালে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবন তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

চাকুরী ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় গা ভাসাইয়া দিলেন। অদ্ভুত ছিল তাঁহার কর্ম্ম শক্তি। এই সময়ে তিনি যে কি সাংঘাতিক পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ইংরেজীতে যাহাকে বলে, "A born leader of men", তিনি তাহাই ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ ইং) কলিকাতায় টাউন-হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহা বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। সেই বিশাল জনতাকে টাউন-হলে সারিবদ্ধ ভাবে সংযত করিয়া নেওয়ার ভার নিযাছিলেন রমাকান্ত। তিনি ছিলেন সেই বিরাট দীর্ঘ মিছিলের পুরোধা। বাঙ্গালীর যে সংগঠন ক্ষমতা আছে, তাহা সেইদিন সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

রমাকান্তের নেতৃত্বে কলিকাতায "এন্টি সার্কুলার সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা হইযাছিল। শ্রমগৌববানুভূতির মর্য্যাদা (Dignity of Labour) রমাকান্তই বাঙ্গালীকে প্রথম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এদেশে ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণি-বাবু এক টাকার মাছ হাতে নিয়া বাজার হইতে আসিতে দ্বিধাবোধ করিতেন। মুটের হাতে মাছ দিয়া বাটীতে পাঠাইতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রমাকান্ত বাবুর নেতৃত্বে যখন 'সোসাইটী'র সভ্যগণ স্বদেশী কাপড়ের মোট মাথায় নিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায তুলে নেরে ভাই' গান গাহিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় কাপড় ফেরি করিতেন, সে দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। রমাকান্তের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখন অনেক উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকও নিজের কাজ নিজে করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, তাঁহার প্রচারিত আদর্শ বহুলাংশে ফলবতী হইয়াছে।

স্বার্থের মলিনতা রমাকান্তের উন্নত হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক। টাকা পয়সার বড় একটা ধার ধারিতেন না। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মাসিক আড়াইশত টাকা বেতনের একটি চাকুরী পাইয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার অনুরক্ত চারিজন বাঙ্গালী ছাত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাইতে উদ্যত হন। রমাকান্ত তাহাদিগকে মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাত্র পঞ্চাশটি টাকা রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের ভ্রাতা বা ভগিনীর জন্যও বোধহয় এতদূর স্বার্থত্যাগ কেহ করিতে পারে না। দেশমাতৃকার বেদীমূলে তাঁহার অকালে আত্মাহুতিও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। দেশের সেবায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। অসময়ে আহার, অনিদ্রা ও গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যাহারা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাস পড়িয়াছেন, কুখ্যাত বরিশাল কনফারেন্সের কথা নিশ্চয়ই তাহাদের জানা আছে। লাঠির ঘায়ে জন-জাগরণকে দাবাইবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজপুরুষেরা "এণ্টি সার্কুলার সোসাইটীর" সভ্যদের ও অন্যান্য স্বদেশ-সেবকদের উপর গুর্খা পুলিস লেলাইয়া দেন। "বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি পুলিশের লগুড়াঘাতে বন্ধ করিবার জন্য রাজপুরুষেরা বদ্ধ-পরিকর হন। ফলে কি দাঁড়াইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পুলিসের এই অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া রমাকান্ত রুগ্নাবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়া প্রলাপ করিতে থাকেন। এই রোগশয্যা হইতে আর তিনি উঠেন নাই। তাঁহাকে এই দুঃসংবাদ উন্মত্তের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে জ্বর-বিকারের ঘোরে তিনি "প্রতিহিংসা" প্রতিহিংসা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সোসাইটীর সভ্যগণকে ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে যাইতে দিতেন না। ইহাদিগকে দেখিলেই তিনি পাগলের ন্যায়

হইয়া উঠিতেন, বিকার প্রবলাকার ধারণ করিত। এইরূপ বিকারের মধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যান (৩রা মে, ১৯০৬ ইং সনে)। বাঙ্গালী যুবকেরা যদি তাঁহার আত্মোৎসর্গ, স্বাধীনচিত্ততা, কর্ম্মশক্তি, স্বদেশপ্রেম ও শ্রম-গৌরবানুভূতি লাভ করিতে সচেষ্ট হন, তবেই রমাকান্তের পবিত্র আত্মার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। রমাকান্তের জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা-মহাযজ্ঞে যাহারা আত্মদান করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম। স্বদেশের জন্য যিনি আত্মবিসর্জ্জন দেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী বীর—অমর। আজ ভক্তি-নম্রশিরে, যুক্ত-করে, সেই "ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ—শহিদ রমাকান্তকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, শ্রীহট্টের ও বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে শত শত রমকান্তের আবির্ভাব হউক! দীনা মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে।

(স্বাক্ষর)—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশ

দশম স্তবক

সর্ব্বজনপ্রিয় আনন্দমূর্ত্তি রমাকান্ত রায়*

শ্রদ্ধেয় ৺রমাকান্ত বাবুর সহিত আমার খুব অল্পদিনেরই পরিচয় ছিল। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি যখন India Club এ ছিলেন তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার পূর্ব্বে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাঁহার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম মাত্র।

তিনি যেমন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় ছিলেন, তেমনি তাঁহার মনটীও ছিল সতেজ। সকলের উপরে তিনি ছিলেন আনন্দমূর্ত্তি। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে মিষ্ট হাসি লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার অন্তরের প্রীতি ও মাধুর্য্যই সর্ব্বদা হাসিরূপে মুখে ফুটিয়া উঠিত এবং তাহাই এক মুহূর্ত্তে পরকে আশ্চর্য্য-রূপে আপন করিয়া লইত। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে মনে হইল যেন তিনি আমার কত আপনার জন এবং যেন আমার কতদিনের পরিচিত। তাঁহার এই প্রীতি ব্যক্তির গণ্ডী ছাড়াইয়া দেশ ও ভগবানে প্রসারিত হইয়াছিল। এবং তাহা প্রিয় কার্য্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

দেশকে তিনি সমগ্র দেহমন প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতেন, তাই তিনি যখন জাপান-প্রবাসী তখন দেশের দুর্ভিক্ষের কথা জানিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই, জাপানের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশের ভাইবোনদের প্রাণ রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তারপর দেশে ফিরিয়া স্বদেশী আন্দোলনে একেবারে আপনাকে ভুলিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে দেশের সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বদেশমন্ত্রে যেন তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় তন্ত্রীগুলি একতানে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

"উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা হিন্দুমুসলমান সকলে ভাই,
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।"

---

* (৺অনঙ্গমোহন রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি)

এই সঙ্গীতটী তাঁরই প্রেরণায় রচিত ও কলিকাতার রাস্তার রাস্তায় গীত হইযাছিল। সঙ্গীতের উদ্দীপনা, বক্তৃতা ও মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় বহিযা রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করা ইত্যাদি নানারূপে তিনি দেশ-মাতৃকার পূজার অর্ঘ্য বহন করিযাছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথমে জাপানে শিক্ষালাভের জন্য গিযাছিলেন; তাঁহার শুভ্রনির্ম্মল চরিত্র, সৌজন্য ও প্রীতি দ্বারা জাপানের নরনারীর হৃদয জয করিযাছিলেন এবং তাঁহার মধ্য দিযা ভারতকে এক অতি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিযাছিলেন। তাঁহার পরে যাহারা সেই দেশে গিয়াছেন তাঁহারা জাপানে তাঁহার কার্য্যাবলীর কথা বারবার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত উল্লেখ করিযাছেন। তিনি নিজে যেমন জগতের জ্ঞান আহরণ করিযা দেশকে উন্নত করিবার প্রযাস পাইযাছিলেন, তেমনি নানা জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিযা আনিবার জন্য নিজের খরচে চারিটী যুবককে আমেরিকায পাঠা-ইযাছিলেন। কিন্তু হায়। তাঁহার জীবন-পুষ্প ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিযা পড়িল। তবে তাহা ত ব্যর্থ হয নাই—পৃথিবীতে যে সুগন্ধ তিনি ছড়াইয়া গিযাছেন তাহা এই ২৫ বৎসর ধরিযা দেশকে আমোদিত করিযা রাখিযাছে। তাঁহার আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদে অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ ছিল না, এবং পরিচযও হইযাছিল অল্পদিনের, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে মনে হইয়াছিল যে অতিনিকট কোন আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় আমাকে কাতর করিযাছে। আর দেশ ও সমাজ তাঁহাকে হারাইযা শক্তিহীন হইল।

একাদশ স্তবক

রমাকান্ত রায়ের মধুর তাপস জীবন*

৺রমাকান্ত রায়ের জীবন নানা ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ-ঔপন্যাসিক নায়কের জীবনের ন্যায় ছিল না, সে ছিল প্রীতি ও পবিত্রতার অরুণ রাগ-রঞ্জিত স্নিগ্ধ মধুর তাপসজীবন। সে জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।

জিলা শ্রীহট্ট জলসুকা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলে ও পরে শ্রীহট্ট জিলা স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি Entrance পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইয়া কলিকাতা আসেন। দেশের স্কুলে অধ্যয়ন কালে এক ক্রিকেট খেলায় রমাকান্ত-প্রমুখ খেলোয়াড় গণের সহিত অপর এক বালকদলের কলহ বাধে। তাহাতে দৈব দুর্ঘটনায় এক বালকের মৃত্যু হইয়াছিল। ফলে এই হইল যে স্থানীয় পুলিশ রমাকান্ত প্রভৃতি বালকগণকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে পাঠাইল। সেই মোকদ্দমা পরিচালন উপলক্ষ এই অভিযুক্ত বালকেরা তাহাদের উক্তিতে এমন সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল যে তাহাতে সকল লোক মুগ্ধ হইয়াছিল।

আমরা কয়েকজন বন্ধু কলিকাতা ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট ১৫নং বাড়ীতে এক মেস গঠন করিয়া বাস করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গরীব পরিবারের লোক, এজন্য কৌতুক করিয়া আমরা আমাদের মেসের বাসাকে ১৫ ফকিরের বাসা বলিতাম, এই নামের ঠিকানায় কখন কখন আমাদের দেশের চিঠিপত্রাদিও পাইতাম। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৮৯৫ ইংরেজীর জুলাই মাসে একদিন রমাকান্ত রায় তাহার ছোট ভাই শ্রীকান্ত রায় ও অপর এক বন্ধুর সহিত আমাদের

---

*৺বাবু রাধাচরণ দাস কর্ত্তৃক বিবৃত

বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকদের মধ্যে শ্রীকান্ত ও অপর বন্ধু আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন, রমাকান্তের সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, আমি দেখিলাম গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, সুষ্ঠু ও সুগঠিত-দেহ এক তরুণ যুবক অপর বন্ধুদের সহ আমাদের বাসায় প্রবেশ করিল। তাহার মুখশ্রী এমন সুন্দর ও কণ্ঠস্বরে এমন লালিত্য যে তাহার প্রথম দর্শনে ও তাহার সহিত প্রথম আলাপেই আমার অন্তঃকরণে তাহার সম্বন্ধে কেমন এক সম্ভ্রম ও ভালবাসার ভাব জাগাইয়া দিল। রমাকান্ত বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আমাদের পনের ফকিরের বাসা-য়ই রহিলেন এবং সিটি কলেজ ভর্ত্তি হইলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে দেশের তৎকালীন অগ্রসর ও উন্নততর মতের মুখপাত্র ছিলেন। ইহাতে আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী হইয়াছিলাম। সমাজের উপাসনাদিতে আমরা প্রায়ই যোগ দিতে যাইতাম। আমাদের দৃষ্টান্তে রমাকান্তও ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন এবং সমাজের উপাসনাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প সময় পরে দেখা গেল রমাকান্তের অনুরাগ আমাদের অনুরাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি সমাজসংশ্লিষ্ট সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া সমাজ-সংশ্রবে দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বসিলেন। এই সকল কাজে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় তাহার নিজের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, রমাকান্ত এফ্-এ ফেইল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন। অধ্যয়ন, আলোচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির চেয়ে বাস্তব কাজ (practical work) করার প্রবৃত্তি রমাকান্তের অতি প্রবল ছিল এবং জগদীশ্বর তাহাকে তদনুরূপ শক্তিও দিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের কাজ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, কোন অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে দেশের কাজ করিবার যোগ্যতা জন্মিবে

কিসে? রমাকান্তের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। তাহার মনে হইল ভারতবর্ষের বিপুল খনিজ সম্পদ ভূগর্ভে ইতস্ততঃ নিহিত রহিয়াছে। অনেক স্থলে বিদেশীয় মূলধনে তাহারই কর্তৃত্বাধীনে সে সম্পদ পরিচালিত হইয়া ভারতবর্ষের ধনভাণ্ডার ক্ষয়িত হইয়া যাইতেছে। ভারতের সেই খনিজ সম্ভারকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া ভারতের অর্থ-সমস্যা সমাধানে সহায় হওয়া ভারতীয় যুবকদের অবশ্য কর্তব্য। রমাকান্তের মনে খনিজ বিদ্যা বা mining art শিক্ষার সঙ্কল্প জাগিল। অনুসন্ধানে জানা গেল জাপানে খনিজ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অনুশীলন হইয়া থাকে। ইহাও জানা গেল যে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে উচ্চদরের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপে না যাইয়া অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে জাপান হইতে তাহা শিক্ষা করার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। রমাকান্ত জাপান যাইতে মনস্থ করিলেন। রমাকান্তবাবুদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না, জাপান যাইবার পাথেয় ইত্যাদি প্রাথমিক ব্যয় বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা সময়সাপেক্ষ। হয়ত বাড়ীর কর্তারা তাহার এই সঙ্কল্প অনুমোদন নাও করিতে পারেন। তিনি কলিকাতা হইতে প্রাথমিক ব্যয় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে সঞ্জীবনীর সম্পাদক বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্রকে ধরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণ বাবু তাহাকে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, সে সময়ে রবী বাবু তাহাদের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া শেলাইদহ কাচারীতে বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বাবুর চিঠি লইয়া রমাকান্ত শেলাইদহ গেলেন। কিন্তু সেখানে রবী বাবুর দেখা পাইলেন না। তিনি কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। যাহা হোক্ কাচারীর অন্য আমলারা বেশ আন্তরিকতার সহিত রমাকান্তের আতিথ্য সৎকার করিয়া দিয়াছিলেন। রমাকান্ত কলিকাতা

ফিরিয়া আসিয়া রবী বাবুর সাক্ষাৎ করিলেন। রবী বাবুর চেষ্টায় তাহারই বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে পাথের অনেকটা সংগৃহীত হইয়া গেল। দাতাদের মধ্যে Wellington Squareএর বাবু হেমচন্দ্র মল্লিক ও বামাপুকুরের বাবু নরেন্দ্র নাথ মিত্র অনেক আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। রমাকান্ত জাপান যাত্রা করিলেন।

মনে পড়ে ১৮৯৮ ইংরেজীর জুলাই মাসে অন্যান্য Luggageএর সহিত এক ঝুড়ি লেংড়া আম ও কয়েক ঠুঙ্গা বহুবাজারের সন্দেশ সঙ্গে দিয়া আমরা তাহাকে প্রসিদ্ধ ফরাসী নাবিক কোম্পানী মেসেজারীর এক জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। বহুদিন একত্রে বাস করায় ও পরস্পরের মধ্যে স্বভাব রুচি নানা বিষয়ের মতামত ও আদর্শের ঐক্য থাকায় রমাকান্তের সহিত বর্ত্তমান লেখকের কেমন একটা ঐকান্তিক অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্য ও প্রাণের টান জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিয়া প্রাণে কেমন একটা অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। কলম্বো হইতে রমাকান্তের প্রথম পত্র পাই। সে পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন সমুদ্র পথে তাহার কোন অসুখ হয় নাই। তাহার স্বাস্থ্য ভালই আছে। আর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-ভঙ্গে ফেনিল আবেষ্টন-শোভিত অনন্ত নীল বারিধির একটী সুন্দর বর্ণনা সহ কলম্বো সহরের আবহাওয়া ও সমুদ্রতটের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় সে চিঠিখানা অতি মনোরমভাবে লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর টোকিও পৌছিয়া রমাকান্ত বাবু পত্র লিখিলেন। সেই পত্র ও তাহার সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরব্যাপী জাপান প্রবাস কালে তিনি বর্ত্তমান লেখককে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি লেখকের বহির আলমিরাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। সেই পত্রাবলী মুদ্রিত হইলে বঙ্গভাষার পত্র-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিত। তাহাতে জাপান সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত রমাকান্তের স্বদেশ-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয়

ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে লেখকের শিলচরে অবস্থান কালে আগুন লাগিয়া তাহার বাসা পুড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সেই সকল পত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জাপান স্বাধীন দেশ। সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশীয় ভাষায়ই অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে জাপানী ভাষা শিক্ষা করা এক বিরাট ব্যাপার। সে ভাষার প্রত্যেক শব্দের জন্য একটী করিয়া স্বতন্ত্র অক্ষর আছে। তাহাতে ভাষার শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা সমান সমান হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি অক্ষরের সংখ্যা দশ হাজারের উপর। যাহা হোক কোনও প্রকারে চলনসই গোছের জাপানী ভাষা শিক্ষা করিয়া রমাকান্ত টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিতত্ত্ব (mining) বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। জাপানে রমাকান্ত ভারতীয় তাপসজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ মৎস্যভোজী জাপানে বাস করিয়াও তিনি নিরামিষ-ভোজী ছিলেন। তাহার এক জাপানী রাধুনী ছিল। সে তাহাকে দিনে দুই বেলা 'খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। ভাত এবং ডাল বা শাক শবজীর ভাজি বা চচ্চড়ি ডাল্‌না যাহা হয় একটা দিত। ডাল দিলে অন্য কোন ভাজি বা তরকারী কিছুই দেওয়া হইত না এবং ভাজি বা তরকারী দিলে ডাল দেওয়া হইত না। অবশ্য প্রত্যেক বার খাওয়ার সময়ই দুধ কিছু পাইতেন। রমাকান্ত ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাহার স্বাস্থ্য ও ভালই ছিল। এইরূপে সবদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া চলায় জাপানে রমাকান্তের অধ্যয়ন-ব্যয় মাসিক ৬০৲ টাকার উপর উঠিত না। রমাকান্তের স্বাভাবিক সত্যনিষ্ঠা, নির্ম্মল চরিত্র, স্নেহ-প্রবণ হৃদয়, উদার বিশ্ববন্ধু ভাব, তাহার মানব সেবা-প্রবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে জাপানবাসীদের সম্মুখে একটী অপূর্ব্ব মানুষের দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত বর্ত্তমানে পরাধীন হইলেও ভারতবর্ষ

জগতকে ভগবান বুদ্ধের ন্যায় একজন বিশ্বগুরু দান করিয়াছে। সেই বুদ্ধের দেশের মানুষ ত এই রমাকান্ত। সে দেশের যুবকদের প্রত্যেকেই কি এক একটী রমকান্ত? এমন হইলে সে দেশ পরাধীন কেন? রমাকান্তের জাপান-প্রবাস কালে এ দেশে একবার এক দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষে দুঃস্থ লোকের সাহায্যার্থে রমাকান্ত জাপানবাসীদের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিযাছিলেন। সেই টাকা জাপান গবর্ণমেণ্টের মারফতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট জাপানের দানরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। একজন প্রবাসী ছাত্রের চেষ্টায় বিদেশ হইতে তদ্দেশবাসী লোকের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করার মধ্যে জাপানবাসীব নিকট সেই ছাত্রটীর কিরূপ সম্ভ্রম ও খাতির ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রমাকান্তের পরে যে সকল ভারতীয় ছাত্র জাপানে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন জাপানবাসীরা তাহাদের মধ্যে রমাকান্তের দৃষ্টান্ত দেখিতে পায নাই। এমন কি কাহারও কাহারও আচরণে ভারতের মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া রমাকান্ত (mining) খনিজ-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় অতি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া খনিতত্ত্ববিৎ ইঞ্জিনীয়ার (Mining Engineer) এই উপাধি (Degree) লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেন। তাহার পর বৎসরখানেক সে দেশের বড় বড় খনির কার্য্য পরিচালনার কাজ করিয়া তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ১৯০৩ ইংরেজীতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথমে ইণ্ডিয়া ক্লাবে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে বাড়ী আসিয়া শ্রীহট্ট সহরেও গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য শ্রীহট্টবাসীরা তাহার বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছিল। বাড়ী হইতে পুনরায় কলিকাতা আসার পরই

রমাকান্ত কাশ্মীর রাজ্যের খনি-শিল্পী ইঞ্জিনীয়ার (Mining Engineer) এর পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন।

রমাকান্ত বাবুর সহিত বর্ত্তমান লেখকের ভ্রাতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র দাসও চাকুরীর অন্বেষণে কাশ্মীর গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ চন্দ্রও কলিকাতায় আমাদের সেই পনের ফকিরের মেসের অন্যতম মেম্বার ছিলেন। তাহার সহিতও রমাকান্তের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। সেও ভারতীয় তাপস জীবনের আদর্শে জীবন যাপন করিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতির জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ প্রতাপ সিংহ কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপ সিংহ একজন রাজতপস্বী ছিলেন। রাজ পরিবারের শিব মন্দিরে জপ, তপ, পূজা, সন্ধ্যা ইত্যাদিতে তাহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন এমন সাধারণ গোছের ও সাদাসিধা রকমের ছিল যে কোন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে দেখিলে কাশ্মীরের মহারাজ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। শিবমন্দিরে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেলে মহারাজের দর্শন পাইতে পারিত। শুনিয়াছি এক আগন্তুক শিবমন্দিরে মহারাজকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। মহারাজ উত্তর করিয়াছিলেন "আমার নাম প্রতাপ সিংহ। লোকে আমাকে জাম্বো ও কাশ্মীর-রাজ বলিয়া থাকে।" সে সময়ে কাশ্মীর রাজ্যে পূর্ত্ত বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ (P.W,D. ও Medical Department) সম্মিলিত (Combined) ছিল। একজন ক্ষমতাশালী বাঙ্গালী ডাক্তার মিঃ এ মিত্র এম, ডি সেই বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। রমাকান্ত বাবুদের কাশ্মীর যাওয়ার অল্প সময় পরেই কৃষ্ণ চন্দ্র, মন্ত্রী মিঃ এ মিত্রের আফিসের প্রধান সহকারী (Head Assistant) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খনি-শিল্পী ইঞ্জিনীয়ার (Mining Engineer) এর পদও সেই বিভাগেরই অন্তর্গত ছিল। ইহাতে সেই বিভাগে তিন জন বাঙ্গালীর সমাবেশ হইয়াছিল।

ইহাতে রমাকান্ত বাবুর কাজ করিবার অনেক সুবিধা ঘটিলেও কাশ্মীর রাজ্যের তদানীন্তন বৃটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধির (British Political Agent এর) ইহা তত মনঃপুত হইল না। হায়। সেই রাজাতপস্বী প্রতাপ সিংহ, মন্ত্রী ডাক্তার এ, মিত্র, খনিতত্ত্ববিৎ (Mining Engineer) রমাকান্ত রায় ও (Head Assistant) প্রধান সহকারী কৃষ্ণ চন্দ্র (তিনি পরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট Superintendent হইয়াছিলেন)—তাঁহাদের কেহই আর ইহজগতে নাই। রমাকান্ত অতি কৃতিত্বের সহিতই তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কাশ্মীরে অশেষ যশঃ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতিক প্রতিনিধি (Politial agent) কাশ্মীর রাজ্যের মাইন গুলিতে ষ্টেইটের নিজ দায়িত্বে কাজ না করাইয়া কোন ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট সেগুলি বন্দোবস্ত দিবার প্রস্তাব করিলেন। অবশ্য কাশ্মীরের মহারাজ সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। দেশীয় রাজ্য গুলির উন্নতিকল্পে সেই সেই দেশের অধিপতিগণের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার কতটা সুযোগ রহিয়াছে, রাজনীতিক প্রতিনিধির (Political agent এর) এই প্রস্তাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে। যাহা হোক রমাকান্ত বৎসরাধিক কাল কাশ্মীরের এই খনিগুলিতে কাজ করিয়া কোন পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন লর্ড কার্জ্জন-প্রবর্ত্তিত বঙ্গ-বিভাগে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে কেমন এক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। সেই যথেচ্ছ (arbitrary) দেশ-বিভাগের প্রতিবাদে সমস্ত দেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে ছিল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উপর এক নির্দ্দয় আঘাত। ইহাতে দেশের সকল লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ দেশে বিলাতী পণ্য (British goods) বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলন খুব জোরের সহিতই চলিতে লাগিল। রমাকান্ত সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

দেশে স্বদেশী বস্ত্র প্রচলন কার্য্যে তিনি নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে খদ্দরের তত প্রচলন ছিল না, বিলাতী সুতায় দেশীয় তাঁতী বা জুলার বুনা কাপড়ই দেশী কাপড় বলিয়া পরিচিত ছিল। রমাকান্ত হাওড়ার হাটে সেই বস্ত্র কিনিয়া কাপড়ের বস্তা কাঁধে করিয়া কলিকাতার বাড়ী বাড়ী ফেরি করিয়া বিক্রী করিতে লাগিলেন। তার দৃষ্টান্তে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাঙ্গালী যুবকও সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপে স্বদেশে কাজ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার কাশ্মীরের চাকুরীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও এবং কাশ্মীর কর্ত্তৃ-পক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি আর দূরদেশ কাশ্মীরে না যাইয়া অপেক্ষাকৃত কম বেতনে রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কাজ গ্রহণ করিলেন। এই রাণীগঞ্জের চাকুরীই তাহার কাল হইল। সেখানে বৎসর খানেক কাজ করিয়াই দারুণ সান্নিপতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ১৯০৬ ইংরেজীর ৩রা মে তারিখে ত্রয়ঃ ত্রিংশ বৎসর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় রমাকান্ত ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার জাতীয়তার আকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন-হারা হইয়া দেশ কতই দরিদ্র হইয়া পড়িল। তাঁহার শূন্য স্থান এপর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। কলিকাতা, শ্রীহট্ট ও বাঙ্গালা দেশের আরও কোন কোন স্থানে তাঁহার স্মৃতি-সভা হইয়াছিল। জীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভের পূর্ব্বেই অকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পটী অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালী যুবকেরা তাহার আদর্শ জীবনের অনুসরণ করিয়া চলিলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে।
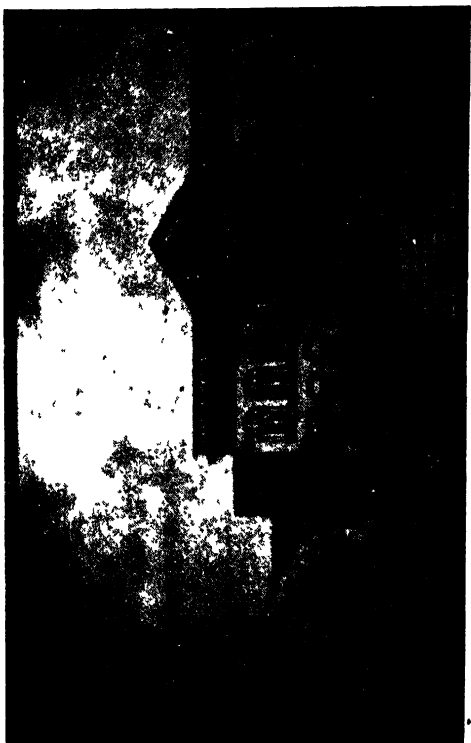
দ্বাদশ স্তবক

রমাকান্তরায়ের গ্রাম ও পরিবার

বৃক্ষ যেমন ফলের দ্বারা পরিচিত হয়, তেমনি ফলের গুণ পরীক্ষা করিতে হইলে বৃক্ষের, জমির, আব্‌হাওয়ার ও পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর অবস্থা ও প্রকৃতি জানিতে হয়। রমাকান্ত যে গ্রামে, যে পরিবারে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা না বলিলে কেবল যে তার জীবন-কাহিনী অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, তাহা নয়, তাঁহার চরিত্র, ধর্ম্মভাব ও সদ্গুণ সমূহের বীজ কিরূপে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়া তাঁহার যৌবনকে পুষ্পিত ও সৌরভান্বিত করিয়াছিল তাহা বুঝিবার পক্ষে কঠিন হয়।

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমার জলসুকা গ্রামে রমাকান্তের জন্ম হয়। এই গ্রাম কুশীয়ারা নামে ভেড়ামোহনার একটি শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটী ক্ষীণকায় হইলেও উভয় তটে শস্য-শ্যামল বিস্তীর্ণ প্রান্তর থাকায় গ্রামের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে মাঠের জমি ধৌত করিয়া ছোট ছোট নালার জল যখন এই নদীতে পতিত হয় তখন লাল, সাদা, ধূসর, মেটে রং-এর মিশ্রণে জলের বর্ণ-বৈচিত্র্য উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে। কিছুদিন জল কাল ও গন্ধযুক্ত থাকায় "মরা গাঙ" এর জল অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। তখন গ্রামের লোক সাধারণত কুয়ার জল বা বিলের জলের উপর নির্ভর করে। আবার কয়েকদিন বর্ষণ হইলেই জল পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়া যায়। এই নদীর গর্ভে জলসুকার অনেক কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে। রমাকান্তের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহাদের বাসগৃহের জন্য যে সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই নদীর স্রোতে ভাঙ্গিয়া চিরকালের মত বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে রমাকান্তের মাতামহ-

বংশের স্থাপিত যে মৃত্যু-শিলা বা স্মৃতি-চিহ্নগুলি বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত জলসুকার গৌরব উচ্চশিরে ঘোষণা করিত, তাহাদেরও এখন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। নদীর গর্ভে এই সকল ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সমৃদ্ধি ও উন্নতির প্রবাহও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া স্মৃতির রেখাটুকু পর্য্যন্ত কালের প্রবাহে মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যে পাড়ায় রমাকান্তের বাড়ী সেই পাড়াটি "গাং (নদী) পারের হাটি" ও যে বাড়ীতে রমাকান্তের জন্ম হয় তাহা "দালানীয়া বাড়ী" নামে এখনও গ্রামের লোকের নিকট পরিচিত। গ্রামের দুই দিক্—উত্তর ও পূর্ব্ব—নদী দিয়া ঘেরা, নদীর অপর পারে বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। এই মাঠের বেশীর ভাগ গোচারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবে কোন কোন স্থানে চাষের জমি ও জঙ্গলী আগাছাও আছে। দূরে মাঝে মাঝে কয়েকটি গ্রাম দেখা যায়, যেমন পিরিজপুর, সল্লা (ভেড়ামোহনার তীরে) কৈয়াঘোপী, নয়াগাঁও প্রভৃতি। এই নদী দিয়া তিন মাইল দূরে পশ্চিমে আজমীরিগঞ্জ বাজারে যাওয়া যায়। দক্ষিণ পূর্ব্বে ছয় মাইল দূরে প্রসিদ্ধ লোকাকীর্ণ বানিয়াচুঙ্গ গ্রাম,-যেখানে ৩৫ হাজার লোকের বসতি। গ্রামের দক্ষিণে প্রকাণ্ড হাওর বা প্রান্তর; তাতে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের অধিবাসীদের জীবন-ধারণ ও অর্থাগমের উপযোগী প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হয়। বর্ষায় ও হেমন্তে এই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের শোভা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া নয়নের তৃপ্তি জন্মায়। বর্ষার সময় ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া পালের নৌকা চালাইয়া মাঝিরা যখন ভাটিয়াল রাগিণীতে গান ধরিয়া দেয়, যখন সবুজ ধান-গাছগুলি জলের উপর মাথা তুলিয়া হাওয়ার তালে দুলিয়া দুলিয়া উপরের আকাশ ও মেঘের সহিত এক মন-মাতান সুরে সোঁ সোঁ করিয়া আনন্দে নৃত্য করে, তখনকার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য ও অব্যক্ত সঙ্গীতের মাধুর্য্য যাহারা চোখে দেখেন নাই, কানে শুনেন নাই, তাহারা কল্পনা করিতে

পারিবেন না। আবার হেমন্তে সোনার ধান ফলিলে গ্রামের চাষীরা যখন হৃষ্টচিত্তে ধানকাটা আরম্ভ করে ও গোয়ালের কাছ থেকে "বাথানের" সর দুধ কিনিয়া প্রাচুর্য্যের ও সন্তোষের উৎসব সম্ভোগ করে, তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়মন ভাবের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিয়া দেয়।

জলসুকার নিকটবর্ত্তী বানিয়াচুঙ্গ গ্রামের সঙ্গে ও আজমিরীগঞ্জ বাজারের সঙ্গে বহুবৎসর যাবৎই রমাকান্ত রায়ের পূর্ব্বপুরুষদের নানা দিক্ দিয়া সম্বন্ধ ছিল, রমাকান্তের জীবনেও সেই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। জমিদারী সম্পর্কে বানিয়াচুঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত ও নগন্য সকলের সহিতই জলসুকাস্থ রায় পরিবারের মিলা-মিশার সুযোগ হইত। রমাকান্তের একজন খুল্লতাত স্বর্গীয় মুকুন্দ রায় অপুত্রক ছিলেন বলিয়া পরে তাহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তিনি বানিয়াচুঙ্গের একটি সম্মানিত কায়স্থ পরিবারের কন্যা বিবাহ করেন। রমাকান্তের মাতুল শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দে মহাশয় দীর্ঘকাল জলসুকা মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টাররূপে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন। আজমিরীগঞ্জের বাজারে রমাকান্তের পিতৃবংশের তেজারতি কারবার ছিল,—তাঁহাদের অনেকে বাজারের বাসায় থাকিয়া যেমন ব্যবসা-বানিজ্যে তেমনি লোকহিতকর অনুষ্ঠানে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এসকল কারণেই হয়ত জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্তের সম্বর্দ্ধনায় বানিয়াচুঙ্গ ও আজমিরীগঞ্জের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ অতিশয় আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

রমাকান্তের পিতা কালী কিশোর রায় ও মাতা উভয়েই সমৃদ্ধিশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী, ন্যায়পরায়ণা, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নারী ছিলেন। তাঁহার সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। গ্রামের সামাজিক দলাদলি, এমন

কি জমিদারী বা ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহার স্বামী, পিতা ও পরিবারের অনেক জ্যেষ্ঠ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার পরামর্শ নিয়া কাজ করিতেন ও তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বহু মামলা বা দরবার আপোষে মিটমাট করিতেন। গ্রামের মেয়েরা সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও স্নেহ-প্রীতি-দয়ার গুণে উপকৃত হইয়া পাড়ার সকলেই তাঁহাকে আপনার জন বা পরমাত্মীয় জ্ঞান করিত। রমাকান্তের মাতামহ-পরিবারে অনেক ক্ষণজন্মা সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থের সঙ্গে পরমার্থের, উপার্জ্জনশীলতাও মিতব্যয়িতার সঙ্গে উদার হৃদয়, দানশীলতা, ও মুক্তহস্তের সামঞ্জস্য জলসুকার রায় পরিবারে যেরূপ হইয়াছিল এমন অন্যত্র অল্পই দেখা যায়। ৺ভাগ্যবন্তরায়, ৺খেলারামরায় প্রভৃতি রমাকান্তের মাতামহ-বংশীয় মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১) প্রাচীন গৃহস্বামী বা পরিবারের কর্ত্তারা প্রতিদিন প্রাতভ্রমণের সময় গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের খবর নিতেন ও কাহার কি অভাব আছে জানিবার চেষ্টা করিতেন। অমুকের ঘরের চালার ছাউনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অমুকের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অমুকের শিশুসন্তান দুধের অভাবে পুষ্ট হইতে পারিতেছে না দেখিয়া আসিতেন, অমনি বাড়ীতে ফিরিয়া কাহারও জন্য ২০ গন্ডা ছন (গৃহের চালার জন্য খড় বা শুকনা ঘাস), কাহারো জন্য এক আঁটি বাঁশ ও বেত, কাহারো বাড়ীতে একঘটি দুধ পাঠাইয়া, কোন গৃহস্থকে হালের বলদ দিয়া সাহায্য করিতেন। সমস্ত গ্রামটিকেই তাঁহারা নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করিতেন। কাহারও মেয়ে বা ছেলের বিবাহের বয়স হইয়াছে, অর্থাভাবে বিবাহের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেনা, তাহার পাড়াপড়-

শীরা কর্ত্তামহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অমনি অর্থ-সাহায্য ও বিবাহ-উৎসবের আয়োজন হইয়া যাইত। যখন কোন বৎসর গ্রামে ভাল ফসল হইত তখন "কর্ত্তা"বাবুরা মাঠের রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শস্য-ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেন ও বাড়ী আসিয়া এই বৎসর পুণ্য কর্ম্মে ও সদনুষ্ঠানে কিরূপে অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে তাহার বিষয় সকলের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। আবার যখন ফসলের অবস্থা খারাপ দেখিতেন তখন গ্রামের গরীব পরিবারগুলি যাহাতে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কষ্ট না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতেন। একবার পাল্কীতে চড়িয়া জমিদার-বংশের প্রধান গৃহস্বামী রায় মহাশয় জলসুকা হইতে বানিয়াচুঙ্গের কাছারিতে যাইতেছিলেন। রাস্তার দুধারে সুন্দর সবুজ ধানের ক্ষেতে শস্য সম্ভাব দেখিয়া তার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে এই সমস্ত জমি যদি আমাদের নিজের বন্দোবস্ত অনুসারে চাষ করান হইত ও এই সব ফসল আমাদের ঘরে আসিত তবে কি অতুল ঐশ্বর্য্যের ও লাভবান সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতাম। মনে যেই এরূপ ভাবের উদয় হইল অমনি তাঁহার আত্ম-পরীক্ষা জাগ্রত হইল। বিবেক-বুদ্ধি ধান্য-লাভ, অর্থ-লিপ্সা, ও ভোগ-বাসনাকে দংশন করিয়া সংযত হইতে উপদেশ দিল। তিনি বাড়ী আসিয়া এই আদেশ দিলেন যে তাঁহার বংশে যতদিন জমিদারী সম্পত্তি থাকবে ততদিন গৃহস্থরূপে জমির হাল চাষ করা নিষিদ্ধ থাকিবে। মুরুব্বির হুকুম আজ পর্য্যন্ত এই পরিবারে পালিত হইয়া আসিতেছে। জমিদারীর সঙ্গে জমির ফসল ভোগ করার লালসা থাকিলে প্রজাদের যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে এই আশঙ্কাই এরূপ নীতির প্রেরক।

(২) তীর্থ-যাত্রা, দান-দক্ষিণা, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে বিপুল আয়োজ-নের সহিত বহু সহস্র লোকের অভ্যর্থনা, প্রীতিভোজন ইত্যাদি এই

পরিবারের বিশেষত্ব ছিল। তখনকার দিনে জলসুকা হইতে নবদ্বীপ, পুরী, বৃন্দাবন, গয়া, কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে যাইতে কত দীর্ঘকালের প্রবাসে পথশ্রম ও অনাহার-অনিদ্রায় দিন কাটাইতে হইত তাহা কল্পনা করিলেও আমাদের ভয় হয়। ছয়মাসের জন্য চাউল চিড়া ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া নৌকা ও গরুর গাড়ীর উপর নির্ভর করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য পথে দস্যুতস্করের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে তখন তীর্থযাত্রা করিতে হইত। জমিদারবাবুদের সঙ্গে গ্রামশুদ্ধ সকল ধর্ম্মভাবাপন্ন বৃদ্ধ নরনারী আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া এক অজ্ঞাত অদৃষ্ট রাজ্যে যখন যাত্রা করিতেন তখনকার দৃশ্য কল্পনা করিলে চোখে জল আসে, হৃদয় স্পর্শ করে।

সকল তীর্থেই এই সদাশয় জমিদারগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কোন স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, কোন স্থানে হরি-সভার গৃহ প্রস্তুত করাইয়া, কোথাও বা তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া, কোন তীর্থে দেবতার চূড়া, বাঁশী ইত্যাদি তৈয়ার করাইয়া, সেবার জন্য বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, বা "আটিয়া" বাঁধিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রাণতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে "কুঞ্জ", পুরীতে যাত্রীনিবাস, নবদ্বীপে হরিসভা এখনও তাঁহাদের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে।

রমাকান্তের মাতৃবংশের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ কয়েকটী উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ৺রাজকিশোর রায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে রায়বাড়ী গলিতে একটি কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কুঞ্জের ব্যয় বাবদ বাৎসরিক ২৫০৲ দেবোত্তর সম্পত্তির আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি কাশীধামে একটি শিব-মন্দির স্থাপন করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠের জন্য সেখানে পাঁচহাজার টাকা (৫০০০৲) নগদ দিয়াছিলেন। সেই টাকা দ্বারা মহাভারত পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছে। গত

১২৭৩ বাং সনে হরিদ্বারের মেলা যুগে সাধুসেবার জন্য পাঁচহাজার টাকা (৫০০০৲) দিয়াছিলেন, ঐ টাকা দ্বারা সাধুসেবা সম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে ৺মহামহোপাধ্যায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হরিসভার পাঠমন্দির তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে ১০০০৲ কি ১২০০৲ ব্যয় হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে (পুরীধামে) ও তাঁহার দানশীলতার বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ৺মুলুকচাঁদ রায় নিজ গুরু-পাটে বাৎসরিক ১০০৲ বৃত্তি দিয়াছিলেন।

৺মদন মোহন রায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে যুগলঘাটে একটি কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ কুঞ্জের ব্যয় বাবদ বাৎসরিক ৩০০৲ (তিনশত টাকা) দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে নিয়মিতভাবে দেওয়া হইত। নিজ গ্রামে (জলসুখা) শ্রীশ্রীনরসিংহ দেবের একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাতে অনেক সাধু অভ্যাগতের নিয়মিতরূপে সেবা হইত। এখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই সেবা স্থাপিত আছে এবং নিয়মিতরূপে সাধুদের সেবা চলিতেছে।

৺রাজকিশোর রায় ৺মুলুক চাঁদ রায়, ৺মদন মোহন রায় ৺নবকিশোর রায়দের স্থাপিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীর সেবার জন্য ও নদীর কিনারায় শ্মশানে শিবমঠ প্রস্তুত করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতঃ ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনও শিবলিঙ্গের পূজা ইত্যাদিতে ব্যয়ের জন্য ৩০০৲ বার্ষিক আয়ের একটি মৌজা দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পুরোহিত পরিবারবর্গ বংশানুক্রমে এ সকল সম্পত্তির আয় ভোগ করিতেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ বহুবৎসর পর্য্যন্ত এরূপভাবে সৎকার্য্যাদিতে অর্থদান করিয়া দেবদ্বিজগুরুগণের সেবার কার্য্য ও অভ্যাগতের অতিথি-সৎকারাদি কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করাইয়া আসিয়াছেন।

একবার দেশে দুর্ভিক্ষের সময় হবিগঞ্জে ৺কৃষ্ণ গোবিন্দ রায় ১১০০৲

টাকা দিয়াছিলেন। ঐ টাকা রাজকিশোর রায়, নবকিশোর রায়, কালা চাঁদ রায় সমভাগে দিয়াছিলেন; এবং হবিগঞ্জ মুন্সেফী আদালতে একটি পুষ্করিণী ৪০০৲ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ উপলক্ষে উৎসবের জন্য শ্রীহট্ট সহরে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় ৺কৃষ্ণ গোবিন্দ রায়, ৺পদ্মলোচন রায় ও ৺শরচ্চন্দ্র রায় উপস্থিত থাকিয়া কাঙ্গালীসমূহের জন্য কয়েক শত টাকার কাপড় বিতরণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে উল্লেখ করিয়া মহারাণীর রাজপ্রতিনিধি ৺কৃষ্ণগোবিন্দ রায়কে একটি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন।

৺নদীয়াবাসী রায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে পাথরপুড়া বড় কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ জিউ স্থাপনা করিয়া সেবার জন্য ২৫০৲ বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। ঐ কুঞ্জে ৺ভারত চন্দ্র রায় অনেক বৎসর বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। গত কয়েক বার দুর্ভিক্ষ হওয়াতে সকলেই কাঙ্গালী সমূহের জন্য চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন।

রমাকান্তের বংশ-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

রমাকান্ত এরূপ ধনী ও সম্মানিত পূর্ব্বপুরুষদের সন্তান হইয়াও ছাত্র-জীবনে অর্থাভাবে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বা বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কাছে আপান হইতে লিখিত পত্রের কয়েকটি অংশ তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(ক) "দেশের কিরূপ অবস্থা জানিতে চাই, এবার কেমন ধান হইয়াছে এবং কি দরে বিক্রী হইতেছে। নানা দেশের দুর্ভিক্ষের খবর পাইতেছি। সাবধান আমাকেও যেন দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতে না হয়, মধ্যে মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে কিন্তু এখনও প্রকৃত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয় নাই। তোমার সরল বিস্তৃত পত্র পাইয়া আর টাকার কথা লিখিতে ইচ্ছা হয় না,

সর্ব্বদাই মনে করি যখন তোমার সুবিধা হইবে তখনই টাকা পাঠাইবা, তবে মধ্যে মধ্যে মনে করিয়া দেওয়া উচিত মনে করি। যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিও" (মাতুল ৺রাখাল চন্দ্র রায় মহাশয়কে লিখিত)।

(খ) "এতদিন যাবৎ খরচের টাকা না পাওয়াতে যারপর নাই চিন্তিত আছি। কাছে নাই যখন ইচ্ছা টেলিগ্রাম করিয়া টাকা আনাইতে পারিব। সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; সর্ব্বদাই কতক টাকা রাখা নিতান্ত দরকার; কখন কি হয় বলা যায় না। কত বিপদ আপদ আছে, কি হয়ত হঠাৎ দেশে ফিরিতে বাধ্য হইতে পারি, কখন বা রোগাক্রান্ত হইতে পারি। সকলেই বিদেশে এরূপ টাকা জমা রাখে। শীঘ্র টাকা না পাইলে বেঙ্কে রাখা দূরে থাকুক হাত একেবারে শূন্য হইবে; আশাকরি তোমরা ক্রটি না করিয়া যত শীঘ্র পার টাকাগুলি পাঠাইয়া দিবা, সর্ব্বদা খরচের টাকার চিন্তা করিতে হইলে পড়ার নিতান্ত ক্ষতি হইবে।" (৺রাখাল বাবু ও ৺ক্ষেত্রবাবুকে লিখিত)

জাপানের Kamatsu Kwam, 22 Tatsua kachs. Hongoku, Tokyo হইতে ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে লিখিত পত্রাংশ হইতে জাপান-প্রবাসী রমাকান্তের সরল জীবন যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়:— "আজকালই এখানে খুব শীত পড়িয়াছে, আমাদের শীতকালেও এত শীত হয় না, রাত্রিতে একখানা লেপ, একখানা কম্বল, একগঞ্জি, এক ফ্লানেলের সার্টে কোনরূপ শীত নিবারণ করা যায়; অবশ্য মনে রাখিও ইহা তাহাদের শরৎকাল। এই কয়মাসই তাহাদেব খুব সুখের সময়। আমাদের দেশ আগুন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। প্রায় সকলেই জিজ্ঞাসা করে "কেমন শীত অনুভব করিতেছি, বিশেষ কষ্ট হইতেছে কিনা।" এখানে সর্ব্বদা স্নান করিতে ইচ্ছা হয়, অথচ এত শীতে স্নান করাও তত কষ্টকর নহে। এখানে রাত্রিতে ৮৷৯টার সময় স্নান করি, গরম জলের চৌবাচ্চাতে স্নান

করি। প্রাতে ৭টার সময় নিরামিষ ঝোল ও ভাত, ১২টার সময় পাউরুটি ও দুধ, বিকালে ৬টার সময় ডাল ও ভাত খাই। সূর্য্য অস্ত ৪টা ২৬মিনিট ও উদয় ৬টা ৪০মিনিট। আজকাল দিন ১০ঘণ্টারও কম (৯ঘণ্টা ৪৬মিনিট)। এখানে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। এখানে আসিবার জন্ত দুই একজন বাঙ্গালী খবর নিতেছে। ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১৫দিনের জন্য শীতের বন্ধ হইবে। এই ছুটিতে কোনও খনিতে কাজ করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা"। (রাখাল বাবু ও ক্ষেত্রবাবুকে লিখিত)

সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশের সন্তান হইয়াও রমাকান্ত কিরূপ সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, কিরূপ বিনীত ও অমায়িক ছিলেন, কিরূপ গরীব দুখীর দরদী ছিলেন ও তথাকথিত কুলিমজুরের মত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের শ্রমসাধ্য কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) রমাকান্তের মাতামহ-বংশে অনেক সাধুপুরুষ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক একজন পরম বৈষ্ণবের মত জীবন যাপন করিতেন ও অন্নজল দেবতার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করিতেন। দেবতার জন্ত কাপড়ের টুকরায় ফুলের মালা তৈয়ার করিয়া দিতেন ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রালঙ্কার নিজ হস্তে সেলাই করিয়া দিতেন। প্রতি দিন সন্ধ্যা কালে মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে বসিয়া সন্ধ্যামন্ত্র জপ করিতেন ও হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। যৌবনে অর্থোপার্জ্জন ও বিষয়-সম্পত্তির সংরক্ষণ ও তত্বাবধান করিয়া শেষকালে বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাস করিতেন। নামাবলী গায়ে দিয়া ফোঁটা তিলক পরিয়া আধারী হাতে মালা জপ করিবার দৃশ্য তাঁহাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। স্বর্গীয় মদন মোহন রায়, সূর্য্যমনি রায় মহাশয়ের ভক্তি ও ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ৺মদন মোহন রায় মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও শেষ জীবনে বৃন্দাবন বাস করিয়াছিলেন। একবার তিনি

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বলিদান প্রথা উঠাইয়া দেওয়া যায় কি না?" যখন তাঁহারা উত্তর করিলেন, "বলিদান ভিন্ন যজ্ঞ বা পূজা সার্থক হয় না।" তখন রায় মহাশয় বলিলেন, "মৃত্তিকা ও খড়ের মূর্ত্তি গঠন করিয়া যেরূপ তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিমা-পূজা হয়, তেমনি মৃত্তিকা ও খড়ের তৈরী ছাগ মেষ প্রভৃতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেই ত চলে।" অহিংসা-ধর্ম্ম সাধনের ইহা হইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

৺সূর্য্যমনি রায় মহাশয় শেষ জীবনে সংসারের মধ্যে বাস করিয়া ও সংসারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে যেমন, গ্রামের অন্য দশজনের সঙ্গেও তেমন সর্ব্বদা হাসিমুখে হরিনাম জপ করিযা "জয়-শ্রীহরি" "জয়শ্রীহরি" বলিযা মাথা ঘুরাইয়া আনন্দে অভিবাদন জানাইতেন। সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ স্থিরধী মুনির মত তিনি বাস করিতেন। শীত গ্রীষ্মে উদাসীন, শোকে আনন্দে সমভাবাপন্ন, মশামাছির তাড়নায় অচঞ্চল, শুচি অশুচি জ্ঞানে অদ্বৈত উদার ভাবের অবতার তিনি ছিলেন। এজন্য কত লোকে তাঁহার নিকট মানস করিত। হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট তিনি সমান ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন।* এরূপ মহাপুরুষদের আবির্ভাবে জলসুখা পবিত্র হইয়াছিল বলিয়াই ইহার মাটিতে রমাকান্তের মত ফসল ফলিতে পারিয়াছিল।

(৪) জলসুখার জমিদারদের আতিথ্য সম্বন্ধে অনেক সুনাম বহু

[*স্মৃতি পূজার তৃতীয় গ্রন্থে তাঁহার জীবন চরিত দ্রষ্টব্য]

প্রাচীনকাল হইতে চলিয়াছে। অর্থের সদ্ব্যবহার তাঁহারা জানিতেন। বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে অজস্র ব্যয় করিয়া জিলার বহুমান্য ভদ্র-মহোদয় গণের আদর অভ্যর্থনা করিতেন। দেবে দ্বিজে অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা; দানশীলতা, পরোপকারব্রত, জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা, বড় বড় রাজকীয় ব্যাপারে চাঁদার খাতার প্রথম নাম স্বাক্ষর ও হাজার টাকা দান ইত্যাদি কীর্ত্তি-অর্জন এই পরিবারের স্বভাব-সুলভ ছিল। তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে যখন বহু পরিজন-পরিবার সঙ্গে বিদেশে যাত্রী-নিবাসে কাল কাটাইতেন তখন তাঁহাদের উন্নত দেহ, সতেজ স্বাধীন শির, বিশাল স্কন্ধ, প্রশস্ত ললাট, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টি, উদার ব্যবহার ও আত্মসম্মান, আত্ম-গৌরব ও আত্মমর্য্যাদারক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি সকলের নিকট তাঁহা-দিগকে বিশিষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়া তুলিত। তাঁহাদের বাড়ীঘর, সাজ-সজ্জা একদিকে উচ্চশিক্ষিত পাশ্চত্য সভ্যতাশালীদের লজ্জা দিত, আর একদিকে তাঁহাদের সরলতা, বিষয় বিমুখতা ও সৌজন্য প্রাচ্যধর্ম ও আদর্শকে গৌরবান্বিত করিত।

সুরমা-উপত্যকা-রাজনৈতিক-সম্মিলনী উপলক্ষে শ্রীহট্ট জিলার বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের শিক্ষিত যুবকেরা ও নেতৃগণ এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ইহার শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তখনকার দৃশ্য অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল রহিয়াছে। সেই "রাজসূয়যজ্ঞে" রমাকান্ত স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তারপরে আসাম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মহামান্য স্যার বীটসন বেল মহোদয় ও স্যার জন কার মহোদয় এই গ্রামে পদার্পণ করিয়া রমাকান্তের জন্মভূমি ও পরিবারকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই বংশ-গরিমা ও কুলধর্ম্মের প্রভাবেই রমাকান্ত জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট অমায়িক উদার প্রকৃতি, মধুর সৌজন্য ও স্বদেশের সমাজের সেবাপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার গ্রামও মাতামহ পিতামহ পরিবার শ্মশানের দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। আগের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, অর্থবল, জনবল, সবই লুপ্ত-প্রায়। প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ মৃত্যুশিলাগুলি নদীগর্ভে বিলীন। অট্টালিকাগুলির ধ্বংসাবশেষও চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তবু ইহার গৌরব বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায় নাই। আজও রমাকান্তের প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় হবিগঞ্জ মহাকুমার মধ্যে বিশিষ্ট পরিদর্শকমহোদয়গণের প্রশংসা অর্জ্জন করে। আজও এই পরিবার হইতে ব্যবস্থাপক সভায় ও লোকেল বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। দু'একজন সরকারী কর্ম্মচারী উচ্চপদে উন্নীত হইয়া কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। আজও একটি রুচিমার্জ্জিত সংস্কৃতি ও ধর্ম্মভাবের হাওয়া এই গ্রামকে রমাকান্তের জন্মভূমি হওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্য দান করিতেছে।

ত্রয়োদশ স্তবক

রমাকান্তের ব্যক্তিগতজীবন—
চরিত্র ও ধর্ম্মভাব।

রমাকান্তের বাল্য জীবন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কয়েকটি মাত্র এই দীর্ঘকাল পরে সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। জাতিভেদের সংস্কার তাহার মন হইতে বাল্যকালেই দূর হইয়াছিল। একবার নৌকাযোগে কোন তীর্থস্থানে (বিথলদের আখড়ায়) যাইবার পথে রমাকান্ত নৌকার মাঝি-দের সঙ্গে ভাত খাইয়াছিলেন। এবিষয়ে সংসাহস দেখাইয়া তিনি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আর একবার একটি নিম্ন-শ্রেণীর লোক ওলাউঠা রোগগ্রস্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল। রমাকান্ত ইহা শুনিয়া নিজে গিয়া তাহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া বাড়ীতে বহন করিয়া নিয়া আসেন ; যতক্ষণ সে রোগমুক্ত না হইল ততক্ষণ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া নিজের ভাইএর মত বাড়ীতে রাখেন। এসকল ছোট ছোট দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া তাঁহার বিশাল হৃদয়ের ভাবী চরিত্র ও স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রমাকান্ত জাপান হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতা হইতে দেশে আসিতেছিলেন তখন তাঁহার একটি মামা ও মামাতভাই জাহাজে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ষ্টিমারে ভাত তরকারীর অর্ডার দিয়া তিনি টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়া সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন দেশে পৌঁছিলেন, তখন মেয়েদের কাছে বলিলেন, "খদনবাবু" তিনদিন হাতে ভাত স্পর্শ করে নাই। ইহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া তাহা-দের খাওয়াইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেয়ানা বড়দের কাছে রমাকান্তের কথার মর্ম্ম বুঝিতে দেরী হইল না।

দেশে একদিন বাঘের সিন্নি করিয়া গ্রামের সকল যুবকদের নিয়া

বনভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহার সহিত অনেকে এক পংক্তিতে বসিয়াছিলেন বলিয়া সামাজিক দলাদলির সূচনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ও রক্ষণশীল গোঁড়া বুয়ের দল রমাকান্তকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। কারণ জাপানে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন ও গ্রীষ্মের ছুট বা পূজার ছুট উপলক্ষে বাড়ী আসিলে জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, বাল্য বিবাহ, বিধবার দুর্দ্দশা, পণ প্রথা প্রভৃতি দেশাচার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন। তখন জলসুকার শিক্ষিত মহলে উদার-নৈতিক ও উন্নতিশীল ধর্ম্মালোচনা চলিতেছিল ও যুবকদের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর হইতেই রমাকান্তের ধর্ম্মভাব ও হৃদয়ের সদ্‌গুণসমূহ বিশেষ অভিব্যক্তির সুযোগ পাইয়াছিল। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তাঁহার ব্যাকুল ঈশ্বরানুরাগ ও জীবনকে উন্নত বিশুদ্ধ ও সরস করিবার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা দৈনন্দিন উপাসনার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। "মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়" —এই সঙ্গীতটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল :—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়? পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যেথায়?

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম, আমি পাপী তৃণসম কেমনে পূজিব তোমায়?

শুনি তব নামের গুণে তারে মহাপাপীজনে, লইতে পবিত্র নাম কাঁপেহে মম হৃদয়।

অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়, কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়?

"এ পাতকী রমাকান্তে তার যদি দয়াল নাথে, বল ক'রে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়।"

"কলিকাতায় ও রাণীগঞ্জে তাঁহার সহিত বাস করিয়া তাঁহার উপসনায় যোগ দিবার সৌভাগ্য যাহাদের লাভ হইয়াছিল তাহারা জানেন এই উপাসনা কত মধুর, কত হৃদয়-স্পর্শী ও কত স্বাভাবিক ছিল। গ্রামে আসিলে প্রায়ই ভোরে উঠিয়া উপাসনার পর লম্বা আলখাল্লা (Dressing gown বা মেকিন্টস, অভারকোট) পরিয়া বাহির হইয়া যাইতেন ও পাড়ায় পাড়ায় কাহার কি অভাব, কাহার কি অভিযোগ আছে তাহার খবর লইতেন। রমাকান্তের বাড়ীর নিকটেই কয়েকঘর নমঃশূদ্র ও পাটনী (মাঝি) বাস করিত। তাহাদের সুখ দুঃখ ও স্বার্থের সহিত রমাকান্ত আপনার সুখ-দুঃখ ও স্বার্থকে এক করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় অবিচার হইলে তিনি জমিদারগণের সঙ্গে দরবার করিয়া প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইতেন না। শুধু পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য নয়, সমগ্র গ্রামের উপরই তাঁহার উদার হৃদয়ের প্রীতি ও শুভাকাঙ্খার আলোক বিকীর্ণ হইত। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলের সহিতই তিনি এমন একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়া লইতেন যে দুই দিনের পরিচয়ে অনেকে চিরজীবনের জন্য তাঁহার পরম বন্ধুস্থানীয় হইয়া উঠিতেন। এক কথায় যথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা বলিতে যে কেবল ভগবানের নাম ও স্বরূপ সাধন নয়, তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইলে যে জীবে দয়া ও মানব জাতিকে আপনার পরিবার মনে করিয়া সকল নরনারীর প্রতি ভ্রাতা-ভগিনীর মত ব্যবহার করিতে হয়, ও বিশ্ব-মৈত্রীর অনুশীলন করিতে হয় তাহা রমাকান্ত আপনার জীবনের সাধনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের যে সকল পরিবারে রমাকান্ত বিশেষ ভাবে মেলামেশার

সুযোগ পাইয়াছিলেন—যে-সকল পরিবারে তিনি আপনার স্নেহের দাবী আদায় করিয়া লইতেন, তাঁহাদের সকলে তাঁহাকে নিজের পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিতেন। রমাকান্তের বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বন্ধুত্বের উচ্চ আদর্শ ছিলেন। বন্ধুরা কেহ তাঁহার বাড়ীতে আসিলে তাঁহাদের সেবার জন্য, প্রীতির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। হাত মুখ ও পা ধুইবার জল, জুতা সাবান ইত্যাদি নিজের হাতে তাহাদের সম্মুখে ধরিতেন। স্নানের সময়, আহারের সময়, পথ্য গ্রহণের সময় কি কি জিনিসের দরকার তাহা অতি নিষ্ঠার সহিত আয়োজন করিয়া রাখিতেন। দুই একটি পরিবারে তিনি বন্ধুত্ব সম্পর্কে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলেন যে তাঁহার বন্ধুদের মাতারা তাঁহাকে আপনাদের নিজের ছেলের মতই মনে করিতেন ও তাঁহার মৃত্যুতে পুত্র-শোকের বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি যেন বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য স্বভাব নিয়াই আসিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্ম-সম্মান বোধ অতি প্রবল ছিল বলিয়াই মনে হয়, অতি ধনী-মানীদের সমাজেও তিনি মর্য্যাদায় উচ্চাসন পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। জাপান হইতে ফিরিবার পরে অনেক স্থানেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে সভা হইয়াছিল। কলিকাতার টাউন হলে এক সভায় মাননীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁহাকে বস্ত্র উপহার ইত্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। রমাকান্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই প্রার্থনাশীলতা ও উপাসনায় নিষ্ঠাই তাঁহার আদর্শমুখীন জীবনের মূল উৎস ছিল। সর্ব্বদা পরমাত্মার দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন। উর্দ্ধমুখীন ভাবে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রতিদিন সকালে পরম পিতার চরণে জীবন ভিক্ষা করিতেন ও তাঁহার সহিত অন্তরের অন্তরে যোগযুক্ত হইয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদনের চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে তিনি সর্ব্বদা জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

যিনি পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পূর্ণতম সকল দৈবী সম্পদের আধার সেই পরব্রহ্মের প্রকৃতি অনুসরণ করিলে, সেই পরম পুরুষের চরিত্র অনুধ্যান করিলে মানুষের জীবন যেরূপ সাত্ত্বিক ভাবে পবিত্র দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, রমাকান্তের সাধনাতে তাহাই ফলিয়াছিল। ঈশ্বরকে পিতাজ্ঞানে অনুধ্যান করিলে সকল মানবে ভ্রাতৃত্বের বিস্তার হইবে ইহা স্বাভাবিক। রমাকান্ত যে বিশ্বপ্রেমিকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার মূলে এই ঈশ্বর-প্রীতি। এই বিশ্বপ্রেম একদিনে বা এক বৎসরে অঙ্কুরিত হয় না। সমগ্র জীবনের সাধনাতে এই আদর্শের ছাপ হৃদয়ে মুদ্রিত হয় ও প্রতি ঘটনায় প্রতি অবস্থায় কার্য্যকরী হয়। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যে, গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহারে, সখার সহিত প্রীতি-আলিঙ্গনে, ভৃত্যদের সহিত, প্রতিবেশীগণের সহিত আচরণে এই বিশ্বপ্রেমের বীজ বিকশিত হয়। পরোপকারে, লোক-সেবায়, রোগীর শুশ্রূষায়, জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মদানে এই বীজকে অঙ্কুরিত করে। স্বদেশপ্রেম, সমাজের হিতৈষণা, স্বজাতি-প্রীতি এই বিশ্বপ্রেমের ছায়া মাত্র। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বনাগরিকতার সম্পর্কে যুক্ত হইয়া রমাকান্ত যে উদার বিশাল হৃদয়ের প্রীতি সকল জীবে সকল ঘটে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র এত সর্ব্বজন-প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। জাপানের রাস্তায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে দেখিলেই "রায় সন" "রায় সন" বলিয়া ছুটিয়া আসিত। তাহাদের সঙ্গে রমাকান্তের যেনকত আত্মীয়তা, তাই তাহারা তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত, তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া, গল্প-গান করিয়া খেলা করিত ও তাঁহার কাছ থেকে খেলনা পাইয়া আনন্দে নাচিত। এই দৃশ্যের সঙ্গে যীশুখৃষ্টের শিশু-প্রেমের তুলনা হইতে পারে—যেখানে মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন "এই শিশুদের আমার কাছে আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য ইহাদের

জন্যই।” রমাকান্ত নিজে সেই স্বর্গরাজ্যের প্রজা ছিলেন বলিয়াই শিশুদের মত সরল, নির্দ্দোষ, প্রফুল্ল তাঁহার অন্তঃকরণ সকলকেই ভালবাসিত, সকলকেই আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিত, নির্ভর করিত এবং শিশুদের মত আত্মপর, শত্রু মিত্র সকলকে এক করিয়া ফেলিত। যে চারিটী যুবককে রমাকান্ত নিজের খরচে শিক্ষাদানের জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় মানিকতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাহাকে রমাকান্ত নিজের সহোদরের মত স্নেহ করিতেন। এই প্রফুল্ল বাবুর মাতা (স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী) ২৪।৪।৩১ তারিখে রমাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

“রমাকান্তের কথা আমাকে লিখিতে বলিয়াছ, আমার এখন একেবারে শক্তি নাই, চিন্তার কাজ এখন কিছুই করিতে পারি না। রমাকান্তের সৎগুণ এখনও ভুলিতে পারি নাই। এমন নিষ্ঠাবান্ ও সত্যবান্, এমন ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তার ভক্তি-শ্রদ্ধা খুব প্রবল ছিল। আমাকে সে কি ভক্তি করিয়াছে তাহা বলিয়া জানান যায় না, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছু কিছু জানেন। প্রতি-দিন ভোর বেলা উঠিয়া উপাসনা হইত, ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়াই সে আমাকে প্রণাম করিত। আমার আহারাদির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিত। আমার চাকরটিও রমাকান্তের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তার জন্য তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। প্রফুল্ল যখন বিদেশে যায় সে আমাকে বুঝাইয়া গেল, “আমার বদলে তোমার এই একছেলে রহিল”। কিন্তু পরের মাকে মা অনেকেই ডাকে, রমাকান্ত যে আমাকে মাতা করিয়াছিল এরূপ আর দেখি নাই। আমার অদৃষ্টগুণে সেই সুখ আর বেশীদিন থাকিল না। রাণীগঞ্জে তোমাদের সঙ্গে কতই আনন্দে কাটাইয়াছি।”

পূজ্যপাদ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—(২১।৪।৩১) "রমাকান্ত বাবু আমাদের, আমার পরিবারবর্গের অতিশয় প্রিয় ছিলেন"।

ভক্তিভাজন প্রিন্সিপ্যাল হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র লিখিয়াছেন—"রমাকান্ত রায় সম্বন্ধে আমার শুধু এই ধারণা যে তিনি একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত-স্থানীয় যুবক ছিলেন।"

রমাকান্ত দেহের আয়তন ও বিশালতা অনুসারে খাইতে পারিতেন। কোন কোন সময়ে হঠাৎ বিনা সংবাদে বন্ধুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া খাইতে চাইতেন ও হাড়ীশুদ্ধ ভাত ডাল সব শেষ করিয়া বন্ধু-পত্নীদের বিব্রত করিয়া তুলিতেন। আবার অনেক সময় অনাহারে বা অল্লাহারে থাকিতে পারিতেন। মাণিকতলার বাসায় থাকিতে প্রায়ই ২টা ৩টা বাজিলে বাড়ী ফিরিতেন ও দুপুরের ঠাণ্ডা ভাত খাইয়া হজম করিতেন। শুনিয়াছি রাস্তায় সঙ্গীদের নিয়া ক্লান্তদেহে একপয়সার ছোলাভাজা বা মুড়ি কিনিয়া সকলে ভাগ করিয়া খাইতেন। এইজন্যই হয়ত অল্প বয়সেই তাঁহার স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হইয়া রোগের অধীন করিয়াছিল ও অকালে মৃত্যু র গ্রাসে তাহাকে ফেলিয়াছিল।

মনে পড়ে বাল্যকালে যখন প্রথম ইংরাজী পড়া আরম্ভ করিয়াছি তখন রমাকান্তবাবু কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া আমাকে ইংরাজীতে এটা ওটার নাম শিখাইতেন ও আমার স্মৃতিশক্তির ও সন্তোষজনক উত্তরের পুরস্কার স্বরূপ কাঁধে করিয়া পাড়ার সব বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন। ১৮৯৭ ইংরাজীর জুনমাসে (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার বিকালে, ১৩০৪ বাংলায়) ভূমিকম্পের সময় রমাকান্ত বাবু ও ধনদাদা (রাধামাধব বাবু) আমাকেও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আশালতাকে নিয়া খেলা করিতেছিলেন (তাস হাতে করিয়া)। এমন সময় হঠাৎ সব বাড়ীঘর কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল ও "ভূই চাল" বা "ভৈভর্দ" আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার শুনা গেল। অমনি

রমাকান্ত বাবু ও ধনদাদা আমাদের দুজনের হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন। সে দিন গ্রামের যত "দালানীয়া" বাড়ীর লোক সকলেই আতঙ্কে রাত্রি কাটাইলেম। রমাকান্ত একবার তাঁহাদের নিজের পাড়ায় নিজের বাড়ীতে, আবার অন্য পাড়ায় অন্য বাড়ীর সকলের খবর নিতে লাগিলেন। কয়েক দিন খুব ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে সকলকে কাটাইতে হইল। রমাকান্ত কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিলে ধর্ম্মবিষয়ক, সমাজ-বিষয়ক অলোচনার ধূম পড়িত। যুবকসমাজে একটা অনুসন্ধিৎসা ও সত্য-নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইত। স্বাধীনভাবে যুক্তি-বিচারের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নেওয়ার একটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত।

গ্রামের সকল বিষয়ে যাহাতে উন্নতি হয় তাহার দিকে রমাকান্তের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়টি। তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে উৎসাহে কয়েকটি মেয়ে একত্র করিয়া এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সে আজ ৪৭।৪৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গ্রামের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি ও সংস্কার করা, কুপ্রথা ও অনাবশ্যক অথচ অহিতকর দেশাচার দূর করা, শিক্ষা বিস্তার করা, দলাদলি ও ঝগড়া মিটান, হিন্দু-মুসলমান ও বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপন, সকলের মধ্যে সখ্য ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করা, মুষ্টি-ভিক্ষার সাহায্যে গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্রদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব মোচন, পাঠাগার (Reading Club), ক্রীড়া ও শারীরিক উৎকর্ষ বিষয়ে প্রতিযোগীতার আয়োজন, সঙ্গীত ও অভিনয়ের ভিতর দিয়া দুর্নীতি দূর করা ও নির্দ্দোষ আমোদের ব্যবস্থা, খাটুনাচ, বাইখেমটা নাচ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, রাস্তা-ঘাটের সুগমতা বিধান, মামলা মোকদ্দমা কমান ইত্যাদি সকল সদনুষ্ঠানে ও শুভ প্রচেষ্টায় রমাকান্তের হৃদয়-মনের শক্তি নিয়োজিত হইত।

"স্বজাতি-হিতসাধন সমিতি" স্থাপনের জন্য রমাকান্তের চিন্তা ও চেষ্টা

বিষয়ে ঢাকার শ্রদ্ধের দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পত্র (৫।৬।৩১ ইং) হইতে নিম্নলিখিত মূল্যবান্ অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এতৎ সঙ্গে বুকপোষ্টে স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুশয্যার ছবিখানা ও তাঁহার সম্বন্ধে "মুকুলে" প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠাইলাম। শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বোধ হয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র*। রমাকান্ত রায়ই কলিকাতায় "স্বজাতি হিত সাধন সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঢাকাতে আসিয়া তাহার শাখা স্থাপন করেন। সে সময় তিনি মাঝে মাঝে ঢাকায় আসিতেন এবং ৯২ নং মাহুতটুলি ছাত্রনিবাসে থাকিতেন। জাপান যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একদিন সেই ছাত্রাবাসে সন্ধ্যার পর আসিয়া অযাচিত ভাবে আতিথ্যগ্রহণ করেন এবং বলেন যে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া বোধ হয় তাঁহার সেই শেষ খাওয়া। তিনি মনে করিলেন যে ইহার পর অর্থাৎ জাপান হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাকে লইয়া স্বজাতীয়েরা একসঙ্গে খাইবেন না। তাঁহারই গুণে তৎকালে ঢাকার ৭।৮ টা 'সাহা' ছাত্রাবাসের পরস্পর আত্মীয়তা সংঘটিত হয়"। (*শিবনাথ শাস্ত্রী)

দুর্গামোহন বাবুর ১৬।৩১ ইং সনের পত্রে 'স্বজাতি-হিতসাধন সমিতি, প্রতিষ্ঠার বিষয় লিখিয়াছেন—

"ইংরেজী ১৮৯৬ সালের শেষ ভাগে বোধ হয় ডিসেম্বর মাসে (আমি তখন F. A.—Ist Yearএ) কলিকাতা হইতে একখানা পুস্তিকা (Booklet) প্রকাশিত হয়। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্ক-চূড়ামণি, ঢাকার রঘুবাবু ও কলিকাতার কয়েকজন ধনী ও শিক্ষিত যুবকের উদ্যোগে কলিকাতায় আমাদের স্বজাতি-হিতসাধন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পুস্তিকার মর্ম্ম এই যে সাহাবহুল ঢাকা নগরীতে সমিতির শাখা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার খুব স্মরণ হয়, ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে ঢাকাতে কোন এক ছাত্রাবাসে (১২ নং

লক্ষ্মীবাজার) স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় ও মাধবচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি আমাদিগকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম সভার অধিবেশন করেন। রমাকান্ত রায় নিজে সমিতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তখন প্রতিমাসে কোন এক ছাত্রাবাসে (সেই সময় ঢাকাতে ৭।৮টি ছাত্রাবাস ছিল) সমিতির অধিবেশন হইত। এবং মফঃস্বলের ছাত্রগণই প্রথমতঃ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল, নিজ ঢাকার ছাত্র কিংবা ঢাকাবাসীর মধ্যে আমি একমাত্র সভ্য ছিলাম।"

সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে রমাকান্তের এরূপ বিপুল উৎসাহ দেখা যাইত। জাপান হইতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা তুলিয়া রমাকান্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসীর সেবা করিয়াছিলেন! আবার রুশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ উপলক্ষে বহুলক্ষ জাপানী সৈন্য আহত হওয়াতে তাহাদের সেবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর বিশ্বমানবের বেদনায় কাতর হইত। যখন যে স্থানে চাকুরী করিয়াছেন তখন সে স্থানেই খনির মজুর ও অন্যান্য কর্ম্মীদের উপকারের জন্য, তাহাদের পারিবারিক সংস্থানের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ইনসিওরেন্স ফণ্ড ইত্যাদি স্থাপনে মনোযোগী হইতেন। তাঁহার প্রাণ বিশ্বজগতের সকল প্রাণীর সহিত এক হইয়া গিয়াছিল, সকলের সুখদুঃখ তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত দিত। কিরূপে একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের যুবক এই উন্নত উদার বিশ্বহিত ও বিশ্ব-মৈত্রীতে সমর্পিত জীবন লাভ করিল তাহা ভাবিবার বিষয়।

রমাকান্তের চরিত্রে যে সকল গুণের সমাবেশ হইয়াছিল তাহা ঈশ্বরোপাসনা ও সরল ব্যাকুলচিত্তে ভগবৎ চরণে প্রার্থনা হইতেই নির্ম্মল প্রস্রবণের মত উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উপাসনা ও প্রার্থনার ফলেই তাঁহার জীবনে উচ্চ আদর্শনিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সর্ব্বদাই সেই সত্যংশিবং সুন্দরং পূর্ণ ব্রহ্মের, শুদ্ধ

অপাপবিদ্ধ পরম পুরুষের ছবি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেন ও তাঁহার মত সকল বিষয়ে উদার, মহান্, প্রেমিক ও পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেন; তিনি ঐশ্বরিক গুণ সমূহের অনুশীলন দ্বারা অনন্তভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। এই সাধনাই তাঁহার সকল কর্ম্মের সকল প্রেরণার উৎস ছিল। বিশ্ব-প্রেম অনুশীলন করিয়াও পরিবারে প্রীতি, জনসমাজে প্রীতি, স্বদেশপ্রীতি বিস্তার করা এজন্যই তাহার পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। এজন্যই তাঁহার জীবনে দীনতা, বিনয়, আত্মপরীক্ষা, আত্মচিন্তা, অনুতাপ এত প্রবল হইয়াছিল। কারণ তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সহিত তুলনায় আপনার বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া, অভিমান অহঙ্কার হইতে মুক্ত থাকিয়া নম্রভাবে জীবনযাপন করিতেন।

তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ এই উপাসনাশীলতা ও বিশ্ব-প্রেমেরই স্বাভাবিক ফল। ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে যে তিনি কেবল উপাসনার অনুকূল ক্ষেত্র ও হাওয়া পাইতেন তাহা নয়, তাঁহার মানব-প্রীতি অবাধে অপ্রতিহত ভাবে এই সমাজে প্রসারিত হইত, কারণ এখানে জাতিভেদ ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল না, সামাজিক আচারে দাসত্বের শৃঙ্খল বা বন্ধন ছিল না, প্রেমের সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ইংরাজ বাঙ্গালী, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু পাপী, স্ত্রীপুরুষ সকলেই এখানে এক পরমেশ্বরের পরিবার হইয়া ভ্রাতা ভগিনীর মত সদ্ভাবে প্রীতিতে বাস করিতে পারেন। এখানে তিনি সেবার ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। সমাজের যত দুর্নীতি, কুসংস্কার কুপ্রথা, অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, দেশবাসীকে উচ্চতর জীবনের পথে, স্বাধীন চিন্তার পথে, স্বাস্থ্যের পথে, সম্পদের পথে প্রেরণা দিবার জন্য, সত্যের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে, নীতির পথে, মঙ্গলের পথে আহ্বান করিবার জন্য তিনি এই সমাজে একটি দাঁড়াইবার

স্থান পাইয়াছিলেন। রমাকান্ত ব্রাহ্ম-সমাজের আধ্যাত্মিক সাধনার হাওয়াতে ধর্ম্মজীবনের দীক্ষা পাইয়া যে শুধু ব্রাহ্মসমাজের সেবায়ই নিজের চিন্তা, শক্তি ও সময় নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি পরমেশ্বরের প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া মানবজাতির সেবায় ও স্বদেশ-জননীর সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহাকে তৎকালীন সকল জনহিতকর আন্দোলনে ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গিয়াছে। যেমন সামাজিক, তেমনি নৈতিক, তেমনি ধর্ম্মবিষয়ক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের ও জগতের নরনারীর যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি খাটিয়াছিলেন, যৌবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তেজবীর্য্য এই যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার নারীজাতির কল্যাণের জন্য আগ্রহাতিশয্য। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার ও নারী-জাতির উন্নতির জন্য তাঁহার কিরূপ উৎসাহ ছিল তাহা গ্রামের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী মহাশয়ার বক্তৃতার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার লাভের এবং পুরুষের সহিত সকল বিষয়ে সাম্য ও সমকক্ষতা লাভের সকল প্রচেষ্টার তিনি প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। এইরূপে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রহিত করা, পণপ্রথা দূর করা ইত্যাদি সমাজ-সংস্কারের অগ্রগতিতে তিনি আনন্দের সহিত আপনার সহযোগীতা দানে প্রস্তুত থাকিতেন। আহারের সময় তিনি পাতের কাঁটা ইত্যাদি মাটীতে ফেলিতেন না, কারণ এ সব উচ্ছিষ্ট মেয়েদের হাতে তুলিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। যে সকল প্রথা ও আচার আমাদের জাতীয় দেহ অসাড় ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনও তিনি ভীত, কুণ্ঠিত, ক্লান্ত বা পশ্চাৎপদ হইতেন না। জাতিভেদের সামান্য ছায়া-স্পর্শও তাঁহার বীর হৃদয়কে উত্তেজিত ও

উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত। সকল অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। ধর্ম্মজগতে পৌত্তলিকতা ও পৌরোহিত্য এজন্যই তাঁহার কাছে অসহ্য ছিল। বিশ্বপতির সিংহাসন সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত, সকল মানব সন্তানেরই তাঁহার নিকট অবারিত দ্বার। ভক্তি ও ব্যাকুলতা নিয়া যে যায়, সেই তাঁহার দর্শন পায়। সুতরাং কোন প্রতিনিধি ও পুরোহিতের আবশ্যকতা কোথায়? অনন্ত দেবতার সান্ত ভঙ্গুর মূর্ত্তিরই প্রযোজন কি? যৌবনের প্রারম্ভেই কলিকাতা ও ঢাকায ছাত্রাবাসে থাকার কালেই তাঁহার মনে এই সকল চিন্তার ও সমস্যার উদয় হইয়াছিল।

যেখানে মানবের চিন্তা, বাক্য বা কর্ম্মকে শাস্ত্রের বন্ধন, গুরুর বন্ধন, সামাজিকতার বন্ধন, দেশাচারের বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, অজ্ঞানতার ও অযৌক্তিকতার বন্ধন দ্বারা শৃঙ্খলিত করা হইযাছে, যেখানে গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ জনসমাজকে অন্যায অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়াছে, সেখানেই রমাকান্তের বীর-আত্মা তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিযাছে, তেজের সহিত তাহা দূর কবিবার জন্য আভিজাত্য সম্প্রদায় ও স্বার্থজড়িত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। তিনি অন্যায, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, ব্যভিচার, দাসত্ব, জড়তা, অন্ধতা, গতানুগতিকের অনুসরণ, গড্ডালিকা প্রবাহ—এসকল তামসিক ও বাজসিক ব্যাপারের জাত-শত্রু ছিলেন। কবি রবিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

রমাকান্ত একদিকে অন্যায় আচরণ ও অন্যদিকে অন্যায়কে অন্যায জানিয়াও নীরবে সহ্য করা, এই দুইএরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। এজন্যই জাতিভেদের কুফল তিনি এত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন

ও ইহার অচলায়তনকে সচল করিবার জন্য, সাপের বিষদাঁত নষ্ট করিবার মত, ইহার অমঙ্গলকর ভেদ-বিচার ভাঙ্গিবার জন্য তিনি প্রাণপণে এত যত্ন করিয়াছিলেন। মানুষের মনকে স্বাধীন করিবার জন্য, চিন্তাকে সতেজ করিবার জন্য, বাক্যকে ভয়হীন করিবার জন্য ও ধর্ম্মকে সংস্কার-মুক্ত করিবার জন্য জগতে যাঁহারা বাঁচিয়াছেন, খাটিয়াছেন ও দেহপাত করিয়াছেন, রমাকান্ত সেই বীর আত্মাদের মধ্যে অন্যতম।

রমাকান্তের বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশ-প্রেম আর একদিক হইতে আমাদের দেশে নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। বলিতে গেলে বঙ্গীয় যুবক সমাজে রমাকান্তই শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আগ্রহ, শিল্পবিজ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা প্রথম উদ্দীপ্ত করেন। তাঁহার জাপান-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ইহাই ছিল। জাপান হইতে যে সকল পত্র লিখিতেন (সঞ্জীবনী পত্রিকায় অনেক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল) তাহাতে সেখানকার শিক্ষার অবস্থা ও শিল্প বিষয়ে জাপানীদের নূতন নূতন উদ্ভাবনা ও বানিজ্য-ব্যবসা হইতে প্রভূত অর্থাগম সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষা-অগ্রসারিণী সমিতি (Society for the Advancement of Scientific and Industrial Education)যে আমাদের যুবকদের বিদেশে গিয়া পড়িবার সুযোগ দিতেছিলেন ও খরচের সাহায্য করিতেছিলেন তাহার মূলে রমাকান্তের প্রস্তাবিত "আনাফণ্ডেই" প্রথম সূচনা দেখিতে পাই। তিনি জাপান হইতে ফিরিবার পর কলিকাতায় কোন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক ছাত্র যদি মাসে একআনা করিয়া শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষাভাণ্ডারে দান করে, তবে কেবলমাত্র কলিকাতা সহরে ১৬ হাজার ছাত্র হইতে মাসিক হাজার টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। এই টাকা দ্বারা প্রতিবৎসর ৪।৫ টি যুবককে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান যাইতে পারে। যদি কলিকাতায় ছাত্রসমাজ বার্ষিক একআনা

করিয়াও দানকরেন, তবেও বাৎসরিক এক হাজার টাকা বা মাসিক ৮০৲র বেশী এই ভাণ্ডারে জমা হইতে পারে ও ইহার সাহায্যে প্রতিবৎসর এক-জন শিক্ষার্থীকে জাপানে পাঠান যাইতে পারে। এই প্রস্তাবটি সংবাদ-পত্রসমূহে ও যুবকদের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি-বিধায়িণী সভা" এই প্রস্তাবটিই কার্য্যে পরিণত করিয়া "চারআনা" ফণ্ডের প্রস্তাব দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। রমাকান্ত লোকশিক্ষাব জন্য, "শ্রমজনক কর্ম্মও গৌরবজনক" এই শুভনীতি প্রচলিত ও প্রচারিত করিবার জন্য, দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসাবতার জন্য যেরূপ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, ও নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যসকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাহা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে বাঙ্গলার যুবক সমাজের কর্ম্মকুশলতা ও অনুপ্রাণনার তারতম্য হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রমাকান্তের দানশীলতা বিষয়ে সঞ্জীবনী পত্রিকায প্রকাশিত (১০ই মে ১৯০৬, ২৭শে বৈশাখ, ১৩১৩ বাং) নিম্নোদ্ধৃত অংশটি স্মরণীয ও প্রশংসনীয়:—"বাবু রমাকান্ত রায়ের দানশীলতা:— রমাকান্ত যখন জাপানে ছিলেন, তখন একজন বাঙ্গালী যুবক আমেরিকাগমনের অভিলাষী হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন। রমাকান্তের হস্তে তখন কেবল মাত্র ৫০০৲ টাকা ছিল। তিনি কাল কি খাইবেন, তাহা না ভাবিয়া সমস্ত টাকা সেই যুবককে দান করিয়াছিলেন!

অল্পদিন হইল ৪টী যুবককে কলিকাতা হইতে আমেরিকায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি টাকা ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনেই ২৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। গত ২১শে এপ্রিল যুবক-চতুষ্টয় আমেরিকা যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তিনি ২৫০৲ টাকা বেতনে

খনির কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন ৫০৲ টাকায় নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিমাসে ২০০৲ তাহাদের জন্ম প্রেরণ করিবেন। এমন মানুষ আমাদের মধ্যে হইতে চলিয়া গিয়াছেন।”

একলব্যের সাধনার মত রমাকান্ত দেশের সর্ব্বাঙ্গীন, সর্ব্বতোমুখীন ও সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্ম তপস্যা করিয়াছিলেন। একাগ্র মনে, একনিষ্ঠ চিত্তে, একদেশ-প্রাণতার প্রেরণায় ও দেশ-মাতৃকার সেবায় তিনি তাঁহার মাত্র তেত্রিশ বৎসরব্যাপী জীবনের শেষ কয়মাসের সকল মুহূর্ত্ত কাটাইয়া গিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :—

“আছে এ জগতে, আছে এ জগতে, এক সে পরম সিদ্ধিস্থান,
(আছে) গৌরবরঞ্জিত সিদ্ধিস্থান,
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে, কে যাবে কার কেদেঁছে প্রাণ।
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে, কে যাবে কার ব্যাকুল প্রাণ।”

রমাকান্ত এই ব্যাকুলতা নিয়া, প্রান-কাঁদান আকাঙ্ক্ষা নিয়া তাঁর লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাই তাহার বাসনা সিদ্ধিস্থানে পৌছিয়া তাঁহাকে গৌরবরঞ্জিত করিয়াছে।

রমাকান্তের পরিবার, বংশ, গোত্র, বা জাতিকুল পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এমন স্থানে পৌছিয়াছিলেন যেথানে

“জনমে মরণে নাহিক লাজ, উজলে জীবন, উজলে কাজ,
রতন ভূষণ, মোহন সাজ বাড়াতে নারে মান।”

তিনি কোন বিশেষ পরিবারে সমাজে বা জাতিতে জন্মিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সাধনা ও তপস্যা তাঁহাকে সেই ক্ষুদ্র পরিবার, সমাজ বা জাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিল, ও তাঁহাকে এক সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, বিরাট, উদার ধর্ম্মের বিশাল প্রাঙ্গণে জগত-সভার নাগরিক পদে বৃত করিয়াছিল। তিনি ঢাকাতে বৈশুসাহা-

সম্মিলনী বা স্বজাতিহিত-সাধন সমিতির সভ্যরূপে খাটিয়াছিলেন ও নিজের গ্রাম, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিবার প্রয়াস হইতে কখন বিরত হন্ নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রাম ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাঁহার পরিবার ছিল মানবজাতির সকল নরনারী, তাঁহার সমাজ ছিল জড়-জীব-নরসমাকুল এই ধরণী, তাঁহার জাতি ছিল ভগবানের ভক্ত-সমাজ। তাই একজন প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ একদিন রমাকান্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার 'সাহাত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে"। কবির ভাষায় বলিতে হয়—

"বড় যার মন, কুলীন সেজন, সবার সেবায় মিলে সিংহাসন,
নিষাদতনয় সেও ক্ষত্র হয়, তেজোবীর্য্যবান্।"

রমাকান্ত এই কুলীনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রমাকান্তের জীবনে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। তিনি যে ভূতত্ব ও খনিজ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য জাপান গিয়াছিলেন, ইহার ভিতরেও তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভাসা ভাসা উপরের চাকচিক্যে ভুলিতেন না, গভীর দেশে ডুবিয়া সার সত্য ও মহামূল্য রত্ন খুঁজিবার সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। যেমন জড়জগতে, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি মাটির নীচে, সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচরে, খাঁটি ধন চিনিবার, জানিবার, লাভ করিবার ও সকলের মধ্যে বিলাইবার প্রকৃতিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন—"পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়া খন্তীকুড়াল দিয়া মাটী খুড়িয়া ঘুরে বেড়াইবার জন্য কেন যে রমাকান্ত বাবু এত অর্থব্যয় করিয়া সুদূর প্রবাসে বিদেশে (জাপানে) বিদ্যালাভ করিতে গিয়াছিলেন", তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ইহা বুঝিবার সাধ্য যদি আমাদের দেশের লোকের থাকিত, তবে আর আমাদের এত দুর্দ্দশা ও দরিদ্রতা ভোগ করিতে হইত না। রমাকান্ত জীবনে উচ্চ আশার বীজ রোপণ

করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার হীন-আশা ব্যক্তির মত ধূলায় শয়ান থাকিতে হয় নাই। উচ্চ আশা তাঁহাকে বলবান্ করিয়াছিল, উন্নত স্তরে উত্থিত করিয়াছিল। "দেবতার ধ্যানে ভক্তের প্রাণে দেবের অধিষ্ঠান হয়"— এই কবি বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

কবি কামিনী রায়ের "একলব্যের সাধনা" হইতে যে কয়েকটি ছত্র উপরে উদ্ধৃত হইল তাহা যেন রমাকান্তরায়ের জীবনে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল। এই বীর সন্তানকে যে মাতা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন তিনি ধন্যা। "প্রেমময়ী" মাতার নাম তাঁহার প্রেমিক ও মাতৃভক্ত পুত্র নিজের জীবনের আচরণে সার্থক করিয়াছেন। "প্রেমময়ী" যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন ও তাঁহার এই বীর পুত্রটির জীবনে স্বগ্রাম-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানব-প্রেম ও সর্ব্বোপরি ভগবৎ-প্রেম ও বিশ্ব-প্রেম কিরূপ বাস্তব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা দেখিতেন, তবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন ও বলিতেন "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" কবিতায় গাহিয়াছেন :—

"স্বদেশের উপকারে নাহি যার মন,
কে বলে মানব তারে—পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান, তারে ধন কে বা কয় ?"

স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায় তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন প্রকৃত মানুষ কিরূপে "স্বদেশের উপকারে" সমগ্র হৃদয় মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন ও তাঁহার ধনসম্পত্তি সকলি দেশের মঙ্গলে ব্যবহার করিতে পারেন।

চতুর্দ্দশ স্তবক

বাল্যবন্ধু রমাকান্ত রায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ*

যখন শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি তখন রমাকান্ত রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, এবং তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই। তিনি তাঁর জন্মস্থান জলসুখার স্কুল হইতে বৃত্তি সহ মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের একশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। পরে বার্ষিক পরীক্ষায় নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া "Double Promotion" পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। কাজেই, আমি ও আমার অপর সহপাঠিগণ তাঁহার একশ্রেণী নীচে পতিত হই। কিন্তু, স্কুলের অধ্যয়ন বিষয়ে এই পার্থক্য আমাদের প্রীতির সম্বন্ধের উপর কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে প্রীতির বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর, প্রগাঢ়তর, হইতে থাকে। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল, সৌম্যমূর্ত্তি, চরিত্রের মাধুর্য্য, হৃদয়ের উদারতা ও নিঃস্বার্থপরতা শুধু আমাকে নহে, রাজেন্দ্র দত্ত, শশী মজুমদার প্রভৃতি অনেক বন্ধুকে তাঁহার পার্শ্বে আকর্ষণ করিয়াছিল।

স্কুলের পাঠ্যাবস্থায়ই সেই তরুণ বয়সেও আমরা রমাকান্তের শুধু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নহে, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষেরও

---

*এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ স্তবক পর্য্যন্ত ছাপা হওয়ার পর সৌভাগ্যক্রমে রমাকান্তের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর (অবসর প্রাপ্ত সব-জজ) মহাশয়ের লিখিত এই নিবন্ধটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ছাত্র-জীবনেই রমাকান্তের ভাবী চরিত্রকুসুমের বীজ ও অঙ্কুর কিরূপ সুগন্ধ বিতরণ করিয়াছিল তাহার পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। এজন্য আমরা লেখকের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আভাস পাইয়াছি। গণিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। আমার যতদূর স্মরণ হয়, বীজগণিতের প্রশ্নগুলির প্রকৃষ্ট উত্তর অনেক সময়ই তিনি সাধারণ প্রচলিত নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে দিতে পারিতেন। তাই, তাঁর ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধুগণ সেই তরুণ বয়সেই আভাস পাইয়াছিলেন যে রমাকান্ত পরিণত জীবনে প্রচলিত মামুলি পন্থা বর্জ্জন করিয়া নবপন্থার উদ্ভাবন করিবেন। তাঁহার প্রকৃতির এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আমাদের এই ধারণা যে অমূলক কল্পনা-প্রসূত নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে রমাকান্তের কলেজে অধ্যয়ন কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুলি শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া Mining Engineering শিক্ষা করিবার জন্য সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব 'বিভূঁই বিদেশ' জাপানে গমন দ্বারা।

রমাকান্ত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই পরীক্ষা দিয়া শ্রীহট্ট হইতে তাঁর স্বগ্রামস্থ বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে রমাকান্ত আমাকে 'Hope' এবং 'Progress' নামক দুই খানা ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক করিয়া নিজেই অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সহজে আমি ব্যুৎপত্তি লাভ করি এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে নিজ ব্যয়ে উক্ত পত্রিকাগুলির গ্রাহক করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে রমাকান্ত যে নিঃস্বার্থপরতা ও লোকহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, উপরি-উক্ত ক্ষুদ্র ঘটনাটি কি সেই চরিত্র-মাহাত্ম্যের পূর্ব্ব সূচনা নহে? এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক, যদ্দারা সেই তরুণ বয়সেই প্রমাণিত হইয়াছিল, রমাকান্ত বন্ধুর জীবন রক্ষার্থ নিজ জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। রমাকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায়

(স্মরণ হয় না কি উদ্দেশ্যে) শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আমি আমার স্নেহপাত্রী এক ভ্রাতুষ্পুত্রী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে জানিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য যাই। সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমি শ্রীহট্টে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রায় উক্ত ব্যাধিতেই আক্রান্ত হই। আমার অভিভাবক তখন তাঁহার কর্ম্মস্থলে অর্থাৎ অফিসে। বাসায় একটি চাকর ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। চাকরটিকে ডাক্তার আনিবার জন্য পাঠাইলে রমাকান্ত ঐ সূত্রেই বোধ হয় সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় এবং ভগবৎকৃপায় আমি শীঘ্রই রোগমুক্ত হই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রমাকান্ত আমার আরোগ্য লাভের পূর্ব্বে আমাদের অপর বন্ধুদিগকে আমার অসুখের খবর দেন নাই। বোধ হয়, অপর বন্ধুগণের আমার সংস্পর্শে রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়ই তিনি ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

যতদূর স্মরণ হয়, রমাকান্ত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষা দেন; কিন্তু, ইংরাজী সাহিত্য কয়েক নম্বর কম পাওয়ার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। অন্যান্য বিষয়ে ভাল নম্বর পাইয়াও শুধু বিদেশীয় ভাষায় অল্প নম্বর পাওয়ার দরুণ তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া আবার পরীক্ষা দিবার জন্য বন্ধুবর্গের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া আর কলেজে ভর্ত্তি হইলেন না। অথচ তিনি ঐ সময় অলসভাবে বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহাকে ঐ সময় অত্যন্ত বিমর্ষ ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া কলিকাতা সহরে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে দেখা যাইত। আমরা তাঁহার এইরূপ আচরণের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন তিনি আমাদিগকে জানাইলেন যে মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর উপদেশ ও অর্থসাহায্যে তিনি

শীঘ্রই Mining Engineering শিক্ষা করিবার জন্য জাপান যাত্রা করিবেন। আমরা তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সংসাহস এবং নূতন পন্থা আবিষ্কর্ত্তার (Pioneer) গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াভিভূত হইলাম।

রমাকান্তের জাপানযাত্রার পূর্ব্বরাত্রের একটি ক্ষুদ্র ঘটনার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করিলে তাঁহার বন্ধুপ্রীতির চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে। জাপান-যাত্রার পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহার কলিকাতার বাসস্থানে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা বিষয়ক কথোপকথনের পর আমার বাসভবনে ফিরিতে প্রবৃত্ত হইলে রমাকান্তও রাজপথে বাহির হইয়া আমাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমার সঙ্গে চলিতে থাকেন। ঐ সময় আসন্ন দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদ বিরহের চিন্তায় আমরা দুইবন্ধুর চিত্ত এত অভিভূত হইয়াছিল যে সময়ের পরিমাণ জ্ঞান আমাদের উভয়ের মন হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। আমার বাসভবন তাঁহার বাসা হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুই বাসার মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় আমরা কতবার একযোগে সেই রাত্রে যাতায়াত করিয়াছি সে দিকে আমাদের লক্ষ্যই ছিল না। পরস্পরের মধুরসঙ্গ ত্যাগ করিতে আমাদের চিত্ত কিছুতেই সম্মত হইতে ছিল না। বাল্য ও তরুণ যৌবনের সখ্য ও প্রীতি এমনি অপূর্ব্ব পদার্থ! অবশেষে গভীর রজনীতে আমাকে এক-প্রকার বলপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বাসায় ফিরাইতে হইয়াছিল। কারণ, পরের দিন তাঁহাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে। তাই, এই বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা রহিয়াছে।

রমাকান্ত জাপান-প্রবাসকালে আমাকে অনেক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া-ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সকল চিঠিপত্র এখন খুঁজিয়া পাইতেছি না। সেইসকল পত্রে তিনি জাপানের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন,

[illegible]গণের অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, জাপানের সৌন্দর্য্যবোধ, চিত্রকলা, [illegible] শিল্প, এবং বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি জাপানের সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতির বিশদ্ বিবরণ প্রদান করেন। জাপানের শিক্ষিতসমাজ কিরূপ দৃষ্টিতে রমাকান্ত রায়কে দেখিতেন তার অভ্রান্ত প্রমাণ তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার এল্‌বামে জাপানের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গ্রুপ ফটোর মধ্যে ঐসকল পরিবারের একজন স্নেহাস্পদ সভ্যরূপে রমাকান্তের স্থান রহিয়াছে।

জাপানে রমাকান্ত বাবু কৃতিত্বের সহিত M.E. উপাধি অর্জ্জন করিয়া বোধহয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় তখন তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়েই তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন,—"The world is my mother-country, God is my father, mankind are my Brothers and Sisters." অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবীই আমার মাতৃভূমি, জগদীশ্বরই আমার পিতা, সমগ্র জগতের নরনারীই আমার ভ্রাতা-ভগ্নী। বন্ধুবরের এই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া তখন সংকীর্ণ-হৃদয় আমার মনে হইয়াছিল তিনি বাস্তবজগতের প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমকে অবহেলা করিয়া কাল্পনিক বিশ্বপ্রেমের মোহে অভিভূত হইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার পরবর্ত্তী (যদিও স্বল্পকালস্থায়ী) জীবনের যে ইতিহাস এই গ্রন্থের অন্যত্র পাঠক-পাঠিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে দেখিয়াছেন, রমাকান্ত রায় কত বড় কর্ম্মবীর, কত বড় স্বদেশপ্রেমিক, কতবড় মানবহিতৈষী, কত বড় ত্যাগী পুরুষ, কত বড় ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন।

লেখক :—শ্রীউপেন্দ্র কুমার কর।

পরিশিষ্ট (ক)

১। জাপান-প্রবাসী রমাকান্তের পত্রাবলী।

রমাকান্ত রায় জাপানযাত্রাকালে ও জাপান-প্রবাস কালে 'সঞ্জীবনী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে পত্র বা প্রবন্ধ পাঠাইতেন। তাহার কয়েকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল। জাপান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রমাকান্ত জাপান (বিশেষতঃ জাপানী ভাষা) সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি নোটবহি হইতে নিম্নলিখিত বিষয়-বিন্যাস উদ্ধৃত হইতেছে :—

জাপান

(ভাষা)

জাপানী ভাষা।

ভূমিকা—যুদ্ধ, ৭ বৎসর পূর্ব্বে 2nd hand Education.

১। জাপানীদের আদিম বাসস্থান, সাধারণ বিশ্বাস—অমুসম্রাট—মুদ্রা ষ্ট্যাম্প, তাই রাজভক্ত, এক বংশ এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। গরম দেশ হইতে আসার প্রমাণ গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

২। ভাষার লালিত্য, কর্কশ শব্দের অভাব, বাকা ইয়ককা জিকান্ধঃ ঝগড়ার অভাব, তাই বোধ হয় গালির অভাব, শুধু বকেনা, কাটে। তাই খুন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৩। সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র—সংখ্যা—গ্রাহক, পাঠক—মূল্য কম তাই গ্রাহক—Empire of Business এর কয়েক Edition, সাপ্তাহিক পত্রের অভাব—সর্ব্বত্র দৈনিক কাগজ।

দুঃখের বিষয় তিনি এই পুস্তক খানা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় লিখিত "জাপানের চিঠি ও জাপানের কথা" তাঁহার ভাগিনেয় ১৯০৬ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করেন। তাহাতে উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন:—

উৎসর্গ

সুন্দর প্রভাত কুসুমের মত
যাঁর জীবন
অপূর্ব্ব শোভায় ও সুমধুর সৌরভে
কত হৃদয়কে
চিরদিনের জন্য মুগ্ধ করিয়া
প্রভাতেই ঝরিয়া পড়িল
এই ক্ষুদ্র প্রীত্যোপহার
সেই মহাপ্রাণ সর্ব্বপ্রথম
জাপান-প্রবাসী, বঙ্গমাতার
সুসন্তান, কর্ম্মবীর রমাকান্ত রায়ের নামে
প্রীতি ও শ্রদ্ধার
সহিত অর্পিত হইল।

এই উৎসর্গ-পত্রের পার্শ্বেই তিনি নিম্নলিখিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন :—

"একটি বীজের মৃত্যুতে অসংখ্য ফলের উৎপত্তি হয়। স্বর্গীয় রমাকান্তের মৃত্যুতে যদি বহুসংখ্যক অন্ততঃ ২।৫ জন বাঙ্গালী যুবক ও তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততা ও আত্মোৎসর্গ, চরিত্রের পবিত্রতা, উৎসাহ, এবং দেশের কাজে মুটে মজুরের মত খাটিতে গৌরবানুভূতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও মরণ সার্থক হইবে।"

রমাকান্ত রায়ের পরে যাহারা জাপান গিয়াছিলেন, তাহাদেরও কেহ কেহ জাপান সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাইতেন। তাহাতে রমাকান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে। এজন্য তাহা হইতেও কোন কোন অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত

জাপান-যাত্রী ও জাপান-প্রবাসীর পত্রাবলী

(১) জাপান যাত্রীর পত্র। কলোম্ব, ১৫ই আগষ্ট।

১৯শে শ্রাবণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাহাজ মান্দ্রাজ ছাড়িয়া চলিল। এত দিন আমি একাকী ছিলাম, সম্প্রতি দুই জন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক আমার কামরাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা দেশীয় পাদরী। বিলাত হইতে জনৈক উচ্চ শ্রেণীর পাদরী দক্ষিণ ভারতীয় মিশন (S. I. S B. Mission) পরিদর্শন করিতে আসেন এবং তিনি দেশে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "এই অঞ্চলে যত লোক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেই নামে বা বাহিরের আচার ব্যবহারে খৃষ্টীয়ান, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া বিলাতের মূল সভাতে এই মিশনের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়। সকলের একমত না হওয়াতে যাঁহারা মিশনের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারা ইহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন। সেক্রেটারী প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী লোক দেখাইতে ও নিজেদের পক্ষ সমর্থনার্থ এই পাদরীদ্বয়কে বিলাতে লইয়া যাইতেছেন। শ্রেষ্ঠ পাদরীর সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তাহার ধর্ম্মানুরাগ "বাইবেল অভ্রান্ত" এই বাক্যেই বিশেষভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কোনও যুক্তি দিবার স্থলে একমাত্র বাইবেলের দোহাই দিয়া থাকেন। ধর্ম্ম দূরের কথা মদ খাওয়া উচিত, ইহা সমর্থন করিতে গিয়া তিনি বলিলেন, স্বয়ং যীশু এক সময় জলকে মদে পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেককে তাহা পান করিতে দিয়াছিলেন।

২০শে শ্রাবণ প্রত্যূষে পণ্ডিচেরী পৌছিলাম। তীরে যাইতে অনুমতি

ছিল না, সমুদ্র হইতেই ফরাসী রাজ্য দেখিয়া লইলাম। দেশীয় লোক নানা দ্রব্য বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিল, তাহারা বেশ দর দস্তুর করে; চারি আনার জিনিষ অনায়াসে দুই আনাতে দেয়। পণ্ডিচেরী হইতে যে সব-যাত্রী আসিল, তন্মধ্যে একজন সাইগণ-যাত্রী। তিনি পণ্ডিচেরীবাসী, সাইগণের ফরাসী গেবর্ণমেণ্টে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত, সস্ত্রীক সাইগণ যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, সাইগণের সৈন্যগণ ভদ্রলোক, নেটিভের উপর অত্যাচার উপদ্রব করে না এবং পথে পথে নেটিভ হত্যা করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিতেও ইচ্ছুক নহে। পণ্ডিচেরী অঞ্চলে বঙ্গ-দেশের ন্যায় উৎকট অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই; একটি মহিলা বেশ সকলের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেন। সেই দিনই অপরাহ্ণে জাহাজ পণ্ডীচেরী ছাড়িয়া সিংহল দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইল। এখন হইতে জাহাজ তীরের নিকট দিয়া যাওয়াতে ভারতের পূর্ব্বদিকে বহু মাইল বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতে লাগিল। ২২শে শ্রাবণ প্রাতে জাহাজ ভারত মহাসাগরে উপনীত হইল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম বঙ্গোপসাগরই ভয়ানক, কিন্তু ভারত মহাসমুদ্রের তরঙ্গের সহিত তাহার তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় না। বঙ্গোপসাগরে কয়েক দিন থাকিয়া সামুদ্রিক পীড়াকে পরাস্ত করিয়াছিলাম, আবার অসুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলাম ও একবার বমি হইল। ইতি মধ্যে পাদরী সাহেব মহাসাগরের তরঙ্গে ভয়ে মান্দ্রাজ ফিরিয়া যাইতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন, তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন শয্যাশায়ী, ভয়ে একান্ত কাতর।

অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টার সময় কলোম্ব পৌছিলাম। সিলোন গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে জাহাজ কোয়েরেণ্টাইনে থাকিতে বাধ্য। ৩০ এ জুলাই অপরাহ্ণ ৬টার সময় আমরা কলিকাতায় জাহাজারোহণ করিয়াছি, তাই ৯ই আগষ্ট ৬টার সময় দশ দিন পূর্ণ হইবে। ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও তীরে নামিতে

দিবে না। কলম্বো হারবারে সর্ব্বদাই অনেক জাহাজ রহিয়াছে, প্রতিদিন দুই তিন খান জাহাজ আসিতেছে ও যাইতেছে। এক প্রকাণ্ড প্রাচীর জাহাজগুলিকে ভারত মহাসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিতেছে। রাত্রিতে হারবার প্রবেশ-দ্বারের দুইদিকে লাল ও সবুজ বর্ণের দুই আলো শোভা পায়; ইহা ভিন্ন সহরে এক উচ্চ আলোক-মঞ্চ আছে। আজ-কাল তরঙ্গ এত প্রবল যে, প্রতিমুহূর্ত্তে উহা হারবার প্রাচীরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দশ, পনর হাত উচ্চে উত্থিত হইয়া প্রাচীরের উপর দিয়া সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে! দেখিতে ক্ষুদ্র জল-প্রপাতের ন্যায়। রাত্রিকালে ভিন্ন ভিন্ন জাহাজস্থ শত শত আলোক হারবারকে সুশোভিত করে। তীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নারিকেল গাছ সচরাচর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী সাইগন-যাত্রী ও আমাকে তীরে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং কোয়েরেণ্টাইনের জন্য তিনদিনে ১১৲ টাকা অতিরিক্ত দিতে আদেশ করিলেন। টাকা দিলাম, কিন্তু কলম্বোতে কোথায় থাকিব, এই ভাবনায় কিছু চিন্তিত হইলাম। সাহেবদের হোটেলে দৈনিক ব্যয় অনেক বেশী, আমার ৮ দিন থাকিতে হইবে, এত টাকা ব্যয় করিতে রাজি নই। সাইগন-যাত্রী তাঁহাদের সঙ্গে কোন পরিচিত স্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন; প্রধান অসুবিধা, তাহারা ইংরাজী বা হিন্দি জানেন না, অথচ আমি তামিল কিম্বা ফরাসী ভাষা জানিনা। যাহা হউক, সমস্ত জিনিষ জাহাজে রাখিয়া, থাকিবার স্থান ঠিক করিতে সাইগন-যাত্রীদের সঙ্গে ১০ই আগষ্ট ৯টায় সময় তীরে আসিলাম, দশদিন পরে এই প্রথম ভূমি স্পর্শ করিলাম। মধ্যাহ্নে আহার করিলাম, কিন্তু বড় তৃপ্ত হইলাম না; কারণ তাহারা বড় পরিষ্কার নহে, রান্নাও আমাদের রুচিমত নহে, সমস্ত তরকারীতেই তেঁতুল, এমনকি মাংসে পর্য্যন্ত তেঁতুল! শুনিয়াছিলাম যে, অনেক বাঙ্গালী কলোম্বয় কোন

এক কলেজে অধ্যাপক ; কিন্তু ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তবু সন্দিহান হইয়া কলেজে খবর লইলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। বাধ্য হইয়া জাহাজ হইতে ৭।৮ দিনের মত কাপড় ইত্যাদি লইয়া সাইগন-যাত্রীর সঙ্গে সেই বাড়ীতে ফিরিলাম। জাহাজ হইতে তীরে আসিতে হইলে প্রতি ট্রাঙ্ক ১০।১৫।২৫ সেণ্ট হিসাবে কাষ্টম-হাউসে টেক্স দিতে হয়। জাহাজে যাইতে বা আসিতে নৌকা ভাড়া ২৫ সেণ্ট বা চারি আনা দিতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ। আমি যে বাড়ীতে আসিলাম, তাহাদের মধ্যে দুইজন ইংরাজী ও একজন হিন্দি জানে। সাধারণত সঙ্কেতে কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমি তামিল জানিনা, তাই স্ত্রী-পুরুষ সকলের নিকট আমোদের বিষয় হইলাম। সাইগন-যাত্রী মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে ইংরাজীতে আলাপ করিতেন। যেমন this is good ইহা কি ভাল? No good ভাল নয়? I no speak English, you no speak French, আমি ইংলিশ ভাষা জানি না ও আপনি ফরাসী ভাষা জানেন না, তবে কি করি? No go যাওয়া উচিত নহে, Day sleep therefore no sleep দিনে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাই আজ ঘুম পাচ্ছে না ; I go, You go আমি যদি যাই তবে আপনি যাবেন ইত্যাদি।

কলোম্বতে বা সিংহলে দুই প্রধান জাতির বাস, এক প্রকার লোক সিংহলী ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলে, তাহাদের অধিকাংশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারাই সিংহলের আদিমবাসী বলিয়া আমার বিশ্বাস। অন্যান্য লোক তামিল ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলে, তাহাদের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ; 'শিবান' দেবতার উপাসক ; শিবানের প্রতিমূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। তাহাদের অনেকের নামের শেষে "পিলে" এই উপাধি আছে, বোধ হয় ইহারা মান্দ্রাজ অঞ্চলে হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিতেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশী, তৎপর খ্রীষ্টান

মুসলমান খুব অল্প। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অধিকাংশ কেথলিক। আমি যাহাদের বাড়ী আছি ও সাইগন-যাত্রী প্রভৃতি সকলেই কেথলিক। আমি তাহাদের সঙ্গে গির্জ্জাতে গিয়াছিলাম। প্রতিমার সম্মুখে সর্ব্বদা আলোক প্রজ্জলিত আছে; খ্রীষ্টানগণ প্রতিমার পদ স্পর্শ করে, অনেকটা আমাদের দেশের হিন্দুদের ন্যায়। এখানে হিন্দুসমাজে বঙ্গদেশের ন্যায় সর্ব্বদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই; সাধারণত ১৮ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইয়া থাকে, পনর বৎসরের পূর্ব্বে প্রায়ই বিবাহ হয় না। এখানকার হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অবরোধ-প্রথা নাই। মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী, সিংহল প্রভৃতি স্থানে অনেক অশিক্ষিত সাধারণ লোক খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী; বঙ্গদেশে এত অশিক্ষিত খ্রীষ্টান দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তিন অঞ্চলের শিক্ষিত লোক সামান্য ক্ষুদ্র রুমাল পরিধানপূর্ব্বক প্রকাশ্য স্থানে স্নান করিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করে না।

কলোম্ব দেখিতে মন্দ নয়, কতকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে অবশ্য কলিকাতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে না। ইলেকট্রীক ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। শীঘ্রই গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবে। রাস্তা-গুলি সঙ্কীর্ণ। সহরের পরিমাণানুসারে গাড়ীর সংখ্যা খুব বেশী। এখানে বিভিন্ন রকমের গাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ, ঘোড়া, গরু ও গাধা প্রভৃতির গাড়ীর মধ্যে মানুষের গাড়ীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আমি এক গাড়ীতে ১২০৮ নং দেখিয়াছি। একজন আরোহীর উপযুক্ত ছোট দুই চাকার গাড়ী একব্যক্তি দ্রুতপদে টানিয়া নেয়, কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল, অথচ ভাড়া খুব কম। চারিজনের উপযুক্ত দুই চাকার গাড়ী একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি, একটি গরুর দ্বারা চালিত, খুব দ্রুত যাইতে পারে। গাধার গাড়ী ভাড়া পাই নাই,

আমার ভাগ্যে কেবল গাধার গাড়ীই চড়িতে বাকি। এখানে কয়েক-খানা ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ আছে, প্লেগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ থাকে, ভারতের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের টাকাই এখানে চলে কিন্তু সাধারণ লোক সিকি দুয়ানি প্রভৃতি নিতে রাজি হয় না। টাকায় ১০০ সেণ্ট, আমাদের চারি আনাতে ২৫ সেণ্ট; ৫০, ২৫, ও ১০ সেণ্ট পর্য্যন্ত রৌপ্য-নির্ম্মিত, ৫ সেণ্ট, এক সেণ্ট ও আধসেণ্ট তাম্র-নির্ম্মিত। সমস্ত জিনিষেরই খুব বেশী মূল্য। মাছ কলিকাতার দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় হয়; ছয়টা পান ও দুই তিনটা সুপারি চারিসেণ্ট; ৫টা ছোট কাঁচকলা ৫ সেণ্ট। এখানে বাসকরা অতি ব্যয়সাধ্য। প্রতি প্রাতে শত শত ক্ষুদ্র নৌকা মাছ ধরিতে মহাসমুদ্রে যায়। দিবারাত্রি কলে জল পাওয়া যায়; স্নানের জন্য স্থানে স্থানে কূয়া ও বড় বড় কাঠের টব রহিয়াছে, জল পরিষ্কার ও শীতল, স্নান করিতে প্রত্যেককে মাসে একটাকা দিতে হয়। সিংলোন গবর্ণরকে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে একজন মাত্র অশ্বারোহী থাকে। তাঁহার প্রাসাদের নিকটই সৈন্যদের বাসস্থান; কয়েক হাজার ইংরাজ সৈন্য, দেশীয় সৈন্য খুব অল্প, দেশীয় সৈন্যরা সকলেই ভারতবাসী। সিংহল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন; কয়েকটা কলেজ ও একটা মেডিকেল কলেজ কলোম্বতে আছে। মেডিকেল কলেজ দুই ভাগে বিভক্ত; ১ম বিভাগে পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়, এল, এম, এস কিম্বা এম, বি উপাধি দেয়; অন্য বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করিলেই পড়িতে পারে; আমাদের ক্যাম্বেলের মত; তিন বৎসর পড়িতে হয়। পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ আফিসের বন্দোবস্ত বেশ উত্তম। চারি আনাতেই টেলিগ্রাম করা যায়; এক টাকাতে urgent টেলিগ্রাম করিতে পারা যায়; আমাদের দেশের অর্দ্ধেক। কার্ডের দাম দুই সেণ্ট, বেশ সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুই সেণ্টে বুক-পোষ্ট পাঠান যায়। দুই সেণ্ট

আমাদের ১।।০ দেড় পয়সা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ কম। চতুষ্কোণ খাম ৫ সেণ্ট দাম। ভারত মহাসাগরের তীরে গ্রীষ্মের দিনে বৈকাল বেলা বেড়ান কিরূপ সুখপ্রদ তাহা আমার বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নাই; আমি কবি নহি, ভাবুকও নহি। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, দশ মিনিট নীল সমুদ্র জলের তীরে থাকিলে মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়, শরীর শীতল হয় এবং আমার ন্যায় শুষ্ক লোকের মনেও ভাবের উদয় হয়।

(২) শনিবার, ১২ই ভাদ্র, সন ১৩০৫ সাল। (সঞ্জীবনী পৃঃ ৭৯)
ভারতবাসী জাপানে কি শিখিতে পারেন?

বাবু রমাকান্ত রায় জাপান হইতে লিখিয়াছেন, "আমি নিরাপদে এখানে পৌছিয়াছি। আরও দুইজন মহারাট্টা ভদ্রলোক অধ্যয়নার্থ এখানে আছেন। একজন আমার সঙ্গে খনিজ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, আর এক-জন Technological Schoolএ ভর্ত্তি হইয়াছেন, applied chemistry course অধ্যয়ন করিতেছেন, কোন প্রকার অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সকলকেই তিন বৎসর নিয়মিত রূপে পড়িতে হইবে, অধিকাংশই practical. এখানে প্রায় সকল প্রকার বিদ্যালয়ই আছে। জাপানীগণ সচরাচর তাহাদের দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করে, কেবল জানালার কাচ তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে না। তাহারা কাচের সুন্দর সুন্দর লেম্প, গ্লাস প্রভৃতি প্রস্তুত করে। মোমবাতিরও কারখানা আছে। যদিও তাহাদের দ্রব্যাদি ইউরোপীয়দের হইতে নিকৃষ্ট, তথাপি ভারতবাসীদের শিখিবার অনেক আছে। এখানে Navigation school ও আছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সকল প্রকার শিক্ষার বিস্তৃত বিবরণ লিখিব। এখানে শিক্ষার্থী ভারতবাসীর ব্যয় ৫০৲ টাকার অধিক লাগিবে না। যদি ছাত্রসংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে ৪০৲ টাকা হইবে। দেশীয়

ছাত্রদের খরচ অনেক কম। এখানকার বড় বড় লোক, এমন কি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি এত যত্ন করেন যে, যাহা অন্য কোন বিদেশে আশা করা যাইতে পারে না। ভারতীয় ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলে, তাঁহাদের নিকট হইতে সকল প্রকার সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, এমন কি বোর্ডিংএর বন্দোবস্তও করা যাইতে পারে।

(৩) (সঞ্জীবনী—১৩০৫ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ)

—জাপান যাত্রীর পত্র—

টোকিও, ১১ই সেপ্টেম্বর।

২রা সেপ্টেম্বর ১টার সময় ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরস্থ উচ্চাঙ্গের নিকট জাহাজ আসিল। তথা হইতে আমরা চারজন ভারতবাসী অন্যান্য যাত্রী সহ কেম্পানীর ক্ষুদ্র ষ্টীমারে ২টার সময় রওনা হইয়া ৩॥টার সময় ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরস্থ চীনের সর্ব্বপ্রধান বন্দর সাংহাই নগরে পৌঁছিলাম। ইহার লোকসংখ্যা কলিকাতা হইতেও অধিক। এখানে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই তিন দেশের তিনটী উপনিবেশ আছে। এই বন্দরে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, জাপান ও চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জাহাজ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল জাহাজই এই বন্দরে ১০।১৫ দিন অপেক্ষা করে। আমাদের জাহাজও জাপান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৫দিন এই বন্দরে মাল গ্রহণ করিবার জন্য অবস্থিতি করিবে। চীনদেশে Treaty port গুলিতে যত কারবার হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ ইংরেজের ও ২১ ভাগ চীন দেশীয়, অবশিষ্ট অন্যান্য দেশীয়দের। নদীর তীর, বিশেষতঃ ইংলিশ উপনিবেশ, বড়ই সুন্দর। সমুদ্র তীর সবুজ বর্ণ ঘাসে পূর্ণ। ক্ষুদ্রাকারে কলিকাতা ইডেন-গার্ডেনের ন্যায় এক বাগান আছে। তথায় বেণ্ড বাজিয়া থাকে।

বিকাল বেলা বহুসংখ্যক ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা বেড়াইতে আসে। প্রায় দেড়শত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলী ইংরেজ উপনিবেশে পুলিশের কার্য্যে নিযুক্ত। তদ্ভিন্ন বোম্বাইবাসীদের ৮টা দোকান আছে। রাত্রিতে কোনও ভারতীয় বণিকের বাড়ী থাকিয়া পরদিন ১০টার সময় রওনা হইয়া ১১।টার সময় জাহাজে পৌছিলাম।

৩রা সেপ্টেম্বর ১টার সময় তথা হইতে রওনা হইয়া ৪ঠা সন্ধ্যার সময় জাহাজ নাগাসাকি পৌছিল। এতদিনের পর জাপানের ভূমি দর্শন করিলাম। জাপানী ডাক্তার আসিয়া সমস্ত আরোহীদিগকে পরীক্ষা করিলে পরে জাহাজ তীরের নিকটে গেল। পর দিন প্রাতে সহরে গেলাম। অধিকাংশ গৃহ কাঠে নির্ম্মিত ও ছাদ খোলার। সহর ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। অনেক হোটেলওয়ালা বোম্বাইবাসীদিগকে দেখিয়া সেলাম করিল। এবং দুই এক কথা ইঙ্গিতে বলিল। সাধারণ-লোকও সামান্য রকম ইংরেজী জানে। জাপানের অন্য কোন স্থানেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৫ই সেপ্টেম্বর ১টার সময় রওনা হইয়া ৬ই ৫টার সময় জাপানের একটী প্রধান বন্দর কোবীতে পৌছিলাম। এখানে কয়েকজন বোম্বাইর বণিকের কারবার আছে ও একজন আমাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহাদের বাড়ীতে আহার করিয়া ষ্টীমারে ফিরিলাম। প্রবলবায়ু—সেইদিন জাপানের অনেক স্থানে প্রবল ঝড় হইয়া অনেক গৃহ ভাসাইয়া নিয়াছে। সুখের বিষয় সেই প্রবল ঝড়ে আমার টুপি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে, আর বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। পরদিন অন্য এক বণিকের বাড়ীতে আহার করিলাম। সহরের অধিকাংশই সমভূমিতে নির্ম্মিত—নিকটেই পাহাড়, পাহাড়ের উপরেও অনেক অট্টালিকা আছে। অনেক বণিকের বাড়ীতে

ইলেক্ট্রীক আলোক দেখিলাম। এই সহর নাগাসাকি হইতে অনেক সুন্দর। অনেক ইউরোপীয় কোম্পানী আছে। ৫টার সময় কোবী ত্যাগ করিয়া জাহাজ ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় ইয়াকোহামা পৌছিল। কোবী ও ইয়াকোহামা প্রত্যেকস্থানেই ডাক্তার আসিয়া আরোহীদিগকে পরীক্ষা করিলেন। ইয়াকোহামাতেও বোম্বাইর অনেক বণিক আছেন। ভারতের একমাত্র বোম্বাইবাসীই এখানে বানিজ্যে নিযুক্ত আছে। রাত্রি কোনও বণিকের বাড়ী রহিলাম। কোবী হইতে মারহাট্টা বন্ধুর নিকটে চিঠি দিয়াছিলাম। তাই তিনি পরদিন প্রাতে আমাকে টোকিও লইয়া যাইতে আসিলেন। ইয়াকোহামা হইতে টোকিও একঘণ্টার রাস্তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৬০ সেণ্ট, আমাদের পনর আনা। এখানকার ডলার yen, আমাদের প্রায় ১৷৷০ টাকার সমান। ১০০ সেণ্টে এক ইয়েন। ৫টার সময় টোকিও সহরের গন্তব্য বাড়ীতে পৌছিলাম।

(৪) (সঞ্জীবনী ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩০৫,)

জাপানযাত্রীর পত্র

টোকিও, ৫ই কার্ত্তিক।

বাল্যকালে বাঙ্গলা কবিতায় পড়িয়াছিলাম, 'অসভ্য জাপান, অসভ্য তাতার' কিন্তু এখন জাপানের পূর্ব্বে 'অসভ্য' বিশেষণ প্রযুজ্য নহে। জাপানের পরিবর্ত্তন ৩১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত আধুনিক উন্নতি বর্ত্তমান সম্রাটের রাজত্ব সময়ে সংসাধিত। একজনের রাজত্বকালে রাজনৈতিক শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি কোনও জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় কিনা, সন্দেহের বিষয়। শিক্ষার উন্নতিই সমস্তের মূল। এখানকার সাধারণ মুটে মজুর পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। স্ত্রীপুরুষ প্রায় তুল্য ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত

জাপানে প্রাপ্ত-বয়স্ক বালক বালিকাদের শতকরা গড়ে ৮০জন বালক ও ৫০জন বালিকা নিয়মিতরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। কোন কোন বিভাগে শতকরা ৭৪জন বালিকা নিয়মিত ভাবে শিক্ষা পাইতেছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকবালিকার জন্য প্রায় ২২৫টি Kindergartens বিদ্যালয় আছে সকলে শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ আমেরিকার সংস্রবে আসিয়া জাপান এত উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানে ইংরেজী প্রধান ভাষা এবং জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান প্রভৃতি দ্বিতীয় ভাষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রই অল্পাধিক পরিমাণে অন্ততঃ দুইটী বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে বিদেশীয় পুস্তকের সংখ্যা দেখিয়া পাঠক পাঠিকা অনুমান করিতে পারিবেন যে তাঁহারা বিদেশীয় ভাষায় কিরূপ আলোচনা করে। পুস্তক-সংখ্যা প্রায় ২॥ লক্ষ, তন্মধ্যে ১০৭০০০ হাজার ইউরোপীয় পুস্তক। অবশিষ্ট জাপানী ও চীনাভাষায় লিখিত। বহুসংখ্যক বালক বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত জাপানে প্রায় ২৬০জন বিদেশীয় শিক্ষকও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে ১২৬ জন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের, ৬০জন গ্রেটব্রিটেন—২২জন ফ্রান্স—ও ১৩জন জার্ম্মান্-বাসী। শিক্ষাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতে ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি ভারতবাসীর কি কি শিখিবার আছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ই জাপানে শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান স্থান। ইহার ভিন্ন ভিন্ন কলেজের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের Civil and Mechanical, Naval Archi-tecture, Technology of Arms, Electrical, Applied Chemistry এবং Mining and Metallurgy প্রভৃতি সাত বিভাগের মধ্যে Applied Chemistryই বিশেষ উপযোগী। ইহাতে Dyeing, Weaving,

Pottery, Glass, Soap, Candle, Match প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য সকলেই কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কেবল সেই বিষয়ের শিক্ষা পাইতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কারণ জাপানী ছাত্র আমাদের প্রায় বি, এ'র তুল্য পড়িয়া ইহাতে ভর্ত্তি হয়। অধিকাংশই Practical, প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২৫।৩০ ঘণ্টা লেবরেটারীতে কাজ করিতে হয়। যাহারা Applied Chemistry পড়িতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে Chemistry ভালরূপে জানা আবশ্যক। কলিকাতা কি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করিলে বিনা পরীক্ষাতে ভর্ত্তি হওয়া যাইতে পারে, নতুবা তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করিবেন। Tokyo Technical Schoolএও Applied Chemistry course আছে, ইহাতে ভর্ত্তি হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এই স্কুলে Dyeing and Weaving, Pottery ও Glass manufacturing এবং Candle ও Soap manufacturing প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখাও আছে, কেহ ইচ্ছা করিলে বিশেষ শাখাতে ভর্ত্তি হইতে পারেন। এখানে প্রায় সকল প্রকার শিল্প কার্য্যের কারখানা আছে। কেহ কেহ প্রথমে কোনও কারখানাতে বিশেষ শিল্প শিখিতে পারেন ও পরে কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কিছুকাল সেই বিশেষ শিল্পবিষয়ক বিজ্ঞান শিখিতে পারেন। এইরূপ ছাত্রের জন্য স্কুলে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

সম্প্রতি আমরা তিনজন ভারতীয় ছাত্র এখানে আছি; একজন আমার সঙ্গে খনিজ বিদ্যা শিক্ষা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন, অন্যজন Tokyo Technical Schoolএ ভর্ত্তি হইয়া Applied Chemistry পড়িতেছেন; তাঁহার glass manufacturing শিখিতে ইচ্ছা। তাঁহারা দুইজনই গোয়ালিয়রের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। প্রায় সকল

বিভাগেই তিনবৎসর পড়িতে হয়। স্কুল প্রাতে ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত হয়। মধ্যে একঘণ্টা বিশ্রাম ও আহারের জন্য ছুট আছে। আহারের সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়। মাছমাংস কি নিরামিষ, দুধ যাহার যেরূপ ইচ্ছা। আম্র ভিন্ন নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও মাছ, বেগুন, কপি, মূলা, কুমড়া প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার তরকারীই পাওযা যায়। জাপান শীতপ্রধান দেশ। মাসিক খরচ ৫০৲ টাকার অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েকজন ছাত্র একত্র থাকিলে ৫০৲ টাকার ন্যূন খরচে থাকা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিজে বাড়ী ভাড়া করিয়া অথবা বোর্ডিংযে থাকা যায়। যে প্রকার প্রণালীতে রান্না করিতে দেখাইযা দিবে, রাঁধুনী সেইরূপেই রান্না করিবে। আমরা এখানকার ভদ্রলোকের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়াছি। বিদেশে এইরূপ সমাদর কোথাও আশা করিতে পারা যায় না। ভারতবাসীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিতে পাওরা যায়। সকলেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে নিতান্ত ব্যাকুল। এখানে প্রায় ৪০।৫০ জন চীনা আছে। চীনের দৃষ্টি বিশেষভাবে জাপানের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কোনও চীনদেশীয় ভদ্রলোক ক্রমশ প্রায় একহাজার ছাত্র জাপানের সকল বিভাগে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কেহ শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে চাহিলে, আমাকে লিখিলে বিশেষ সুখী হইব। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এখানে সেসন আরম্ভ হয়। কেহ আসিতে হইলে মার্চ্চমাসের শেষ ভাগে রওনা হইলে সকল প্রকারে উত্তম বন্দোবস্ত করা যায়, ও কিছুদিন পূর্ব্বে আসা নিতান্ত দরকার।

(৫) (সঞ্জীবনী ১লা মাঘ ১৩০৫), টোকিও, ১৮ই অগ্রহায়ণ

জাপানে শিক্ষার উন্নতি

জাপানে শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। আশ্চর্য্যের

বিষয়, এত কঠিন চীনদেশীয় অক্ষরে লিখিত খবরের কাগজগুলি সাধারণ, মুটে, গাড়োয়ান্, চাকরাণী পর্য্যন্ত অনায়াসে পড়িতে পারে। এদেশে জার্ম্মাণী ও আমেরিকার অনুকরণে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত। প্রাইমারী স্কুল হইতে উচ্চস্কুল পর্য্যন্ত সকল স্কুলেই নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। ৩০ বৎসরের নিম্নে সকলে এক দুই বৎসরের জন্য সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে বাধ্য।

অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রায় ২২৫টি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে, তাহাতে প্রায় ১৮৭০০ বালক-বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। প্রাইমারীস্কুল নিম্ন ও উচ্চ দুইভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে চারি বৎসর পড়িতে হয়; তবে যাহারা মধ্য-শ্রেণী স্কুলে পড়িতে ইচ্ছুক, তাহারা উচ্চপ্রাইমারীতে দুইবৎসর পড়িয়াই উচ্চস্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। উচ্চপ্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য জাপানী ভাষা, চীনভাষা, সামান্য ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোলবিবরণ, অঙ্ক পাটীগনিত শেষ, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, রসায়ণ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, নরনারীর তত্ত্ব ও খনিজ প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তক। কোন কোন উচ্চপ্রাইমারী স্কুলে বিশেষ ছাত্রদের জন্য কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মোট, ২৬, ৮৫০ বিদ্যালয়ে ৩৯,০০,০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। বালক-বালিকাদের জন্য একই বিদ্যালয়, তবে প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্ শাখাতে পড়ান হয়। মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঁচবৎসর পড়িতে হয়। চীনভাষা, জাপানী ভাষা, ইংলিশ (কোন কোন স্কুলে জার্ম্মান), ইতিহাস, ভূগোল, পূর্ব্বোক্ত সবগুলি বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ, অঙ্ক, জ্যামিতি, ত্রিগণোমিতি, বীজ-গণিত। ইহা আমাদের এফ, এ, পরীক্ষার তুল্য, কিন্তু বিজ্ঞান অনেক বেশী। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতে আবশ্যকবোধে কোনও শিল্পবিদ্যা বিষয় শিখিতে পারা যায়। ১২১টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০, ৮০০ জন ছাত্র

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। মধ্যশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয়ের নাম উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয়। তাহাতে ছয় বৎসর পড়িতে হয়, আবশ্যকবোধে এক বৎসর ন্যূনাধিক্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। যাহারা নিয়মিত পাঠ শেষ করিয়াছে, তাহাদের জন্য দুই বৎসর অনধিক কালের জন্য বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ১৯টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪২০০ বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

মধ্যশ্রেণীব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হয়। ইহাতে ৩ বৎসর পড়িলে, প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার শিক্ষা দেওয়া হয় (Preparatory courses to the Universities)। কোন কোন স্কুলে চিকিৎসা-বিদ্যা, মাইন ও ইঞ্জিনীয়ারিং চারি বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি বিভাগ, এই বিদ্যালয়গুলিতেও ততগুলি বিভাগ। চীনা জাপানী ভাষা, ইংলিশ বিদেশীর প্রধান ভাসা, জার্ম্মাণ কি ফ্রেঞ্চ বিদেশীব দ্বিতীয় ভাষা, কিন্তু চিকিৎসা-বিভাগে জার্ম্মাণ প্রধান ভাষা ও ইংলিস দ্বিতীয় ভাষা। শেষ পরীক্ষা বি-এর তুল্য অনারের সমান কিন্তু বিজ্ঞান নানাবিধ। ৬টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে জাপানে বিশ্ববিদ্যালয় একটি। যদিও কিওটোতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কার্য্য এখনও পূর্ণ হয় নাই। কেবল দুই তিন শাখা খোলা হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রস্তুত করিতে বহুসংখ্যক ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠান হইয়াছে। মেডিকেল কলেজ ভিন্ন সাধারণতঃ তিন বৎসর পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি বিভিন্ন কলেজে বিভক্ত, যথা—(১) Law College এ Politics ও Law এই দুই শাখা; (২) Medical College এ Medicine ও Pharmacy; (৩) Engineering College এ Civil, Mechanical,

Naval Architecture, Technology of Arms, Electrical Engineering, Architecture, Applied Chemistry ও Mining এবং Metallurgy এই আট বিভাগ; (৪) Literature College এ Philosophy, Japanese literature, Chinese literature, English & German literature, French literature, Japanese History, Chinese History, Philology এই নয় শাখা, (৫) Science College এ Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Zoology and Botany, Geology এই ছয়টি ভিন্ন শাখা (৬) Agriculture College এ Agriculture, Agricultural Chemistry, Forestry ও Veterinary Science এই চারি বিভাগ আছে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক কলেজেই Post-Graduate courses রহিয়াছে। টোকিও Imperial বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১৮৫০ ছাত্র আছে। Literature College এ কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও ডাইরেক্টার তৈয়ারী করিবার জন্য ৪৭টী সাধারণ নর্মালস্কুলে ৭২৫ জন বালিকা সহ প্রায় ৬, ৪০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। মধ্যশ্রেণী স্কুলের সাধারণ নর্মাল স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একটি মাত্র উচ্চশ্রেণীর নর্মাল স্কুল আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০ জন ছাত্র। উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় ও সাধারণ নর্মাল স্কুলের শিক্ষক ও ডাইরেক্টারদের শিক্ষার জন্য একটি মাত্র উচ্চশ্রেণীর নর্মালস্কুলে প্রায় ১৪০ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

৬৭ Technical স্কুলে ৮,৮৫০ জন ছাত্র আছে। তন্মধ্যে Higher Commercial School, Tokiyo Technical ও Tokiyo Fine Arts স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উচ্চশ্রেণীর বাণিজ্যের ম্যানেজারের উপযোগী

লোক প্রস্তুত করিতে কিম্বা নিম্নশ্রেণীর বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্কুলের শিক্ষক প্রস্তুত করিতে এই Higher Commercial School এ শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪২৫ জন। Tokiyo Technical School এর কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

বিশেষ স্কুলের (Special Schools) সংখ্যা প্রায় ৪৪, তাহাতে Law, Literature, Political Economy, Science প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮৮০০ জন।

চারিটী অন্ধ-মূক-বধির বিদ্যালয়ে ২৬০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, প্রায় ১১৫০ টী বিবিধ বিদ্যালয়ে প্রায় ৬৮৪০০ জন নানা বিষয় শিখিতেছে, বিবিধ স্কুলের মধ্যে প্রায় ১২টা বিদ্যালয় প্রাইমারী স্কুলের ও ৫১ টা মধ্য-শ্রেণী বিদ্যালয়ের সমতুল্য।

Artisan ও Workmen তৈয়ার করিবার জন্য প্রায় ১৭টী Apprentice স্কুল আছে। এই বিদ্যালয়গুলি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্কুলগুলিতে Dyeing, Weaving, Embroidery, Artificial Flowers, Tobacco manufacture, Sericulture, Seeling, Wood Work, Metal Work, Lacquer Work, Gold lacquering প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য এক স্কুলে প্রায়ই তিন বৎসরের অধিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৮০০ জন।

Supplementary Schools (for technical instruction) এর সংখ্যা প্রায় ১০০। কোন Practical pursuit এ নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক বালকদিগকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলিও প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে গণ্য। ইহাতে ৩ বৎসর পড়িতে হয়। ছাত্রসংখ্যা ৫৫০০।

সংক্ষেপে জাপানের শিক্ষা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া গেল। পাঠক পাঠিকাগণ,

জাপানের খবর পাঠের সময় মনে রাখিবেন যে জাপান একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, লোক-সংখ্যা ৪ কোটী মাত্র। জাপানী প্রাইমারী স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত Technical শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত জাপানে ২৬৪ জন বিদেশী শিক্ষক আছেন।

এখানে প্রধানতঃ glass, porcelain, match, candle, umbrella paper, soap, wool, silk প্রভৃতি manufactory আছে। ইহা ভিন্ন বিবিধ প্রকারে শিল্প আছে। আমাদের কতই শিখিবার রহিয়াছে। একজন বোতল manufacturing শিখিতে পারিলে কত উপার্জ্জন করিতে পারেন। ৺চন্দ্রকিশোর সেনের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে তাঁহাদের নামাঙ্কিত যত বোতল তৈয়ার হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দুইজনকে এখানে বা অন্যত্র এই শিল্প শিখিতে পাঠাইতে পারেন। জাপানের Silk, Porcelain ও Match জগদ্বিখ্যাত। সিটি, রিপন ও মেট্রোপলিটন কলেজে Tokeyo Imperial University Calender পাঠান হইবে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া থাকিবে। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অতি মনোরম চিত্র তৈয়ারি হয়। মানুষের ছবি তত সুন্দর নহে। কিন্তু জীবজন্তুর চিত্র অতীব মনোমুগ্ধকর, বিশেষতঃ রেশমে বুনা ছবিগুলি। কেহ আসিয়া চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারেন।

(৬) (সঞ্জীবনী, ১৩০৫, ২৮শে ফাল্গুন,)

জাপান-প্রবাসীর পত্র

টোকিও, ১২ই মাঘ।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে কখন কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন হয় বলা যায় না। একদিন যে দেশ জগতে শীর্ষস্থানীয় ছিল, তাহাই আবার কালে অধঃপতিত হইয়াছে; যে জাতি অসভ্য বলিয়া গণ্য ছিল, তাহারাই

আজ আপন চেষ্টায় উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছে। 'অসভ্য জাপান' সম্প্রতি সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এক শক্তিরূপে গণ্য হইতেছে। যদি শক্তিপুঞ্জ স্বার্থসিদ্ধির মানসে চীনসাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেও জাপানকেও অংশ দিতে হইবে। জাপান-যুদ্ধের পূর্ব্বে কোরিয়া চীনকে আত্মীয় মনে করিত, যুদ্ধের ফলস্বরূপ কোরিয়া স্বাধীন হইয়া জাপানের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কোরিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট নিজ একশত ছাত্রকে জাপানে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যে স্কুল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন এমন নহে। অধিকাংশই জাপানী গভর্ণমেণ্টের নানা অফিসে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন। আমাদের পরিচিত চারিজন Tokyo Technical স্কুলে ও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছেন। যে জাপান চীনদেশের পদতলে একশত বৎসর নহে, দুই শত বৎসর নহে—চতুর্দ্দশ শত বৎসর কাল বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছে, আজও যাহার অস্থিমজ্জাতে চীনভাষা ও চীনজ্ঞান প্রবিষ্ট রহিয়াছে—আজও যাহার সাহিত্য, ভাষা চীন অক্ষরে লিখিত, সেই জাপানে শিক্ষা করিতে প্রাচীন চীন শত ২ ছাত্র প্রেরণ করিতেছেন এমন নহে, চীনের কোনও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নিম্নশিক্ষার নিয়মাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দুইজন উপযুক্ত লোক জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট চাহিয়াছেন। জাপানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চীনের হিতাভিলাষী ; চীনের লোক বুঝিতে পারিয়াছে, জাপান ভিন্ন তাহাদের হিতার্থী কেহ নাই। প্রকৃত পক্ষেই জাপান চীনের বন্ধু। চীনের ভাষা ও জাপানী ভাষা প্রায় একরূপই, কেবল উচ্চারণ ভিন্ন, কাজেই চীনের ছাত্রেরা সহজেই জাপানী বুঝিতে বা শিখিতে পারে। কোরিয়ানগণও জাপানী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারে, তাহাদের চীনাদের ন্যায় লম্বা টিকি নাই।

বোম্বে, কোলাপুর হইতে একজন অধ্যাপক দশজন ছাত্র সহ এখানে

আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ হইতে শীঘ্রই দুইচারিজন ছাত্র আসিবে,—এরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে, বোম্বে হইতেও কয়েকজন পত্র দিয়াছেন এবং আমিও ছাত্রদের নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়াছি। যাহারা ইউরোপ, আমেরিকায় গিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে জাপান আসিবার প্রয়োজন নাই। এখন পর্য্যন্ত সেই সকল স্থান শিক্ষা সম্বন্ধে জাপান হইতে শ্রেষ্ঠ, তাই আজকালও জাপানী ছাত্রগণ তথায় শিক্ষার্থ যাইতেছে। তবে খরচ, জলবায়ু, আহার প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে এখানে সুবিধা। প্রথমতঃ শীতের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু আমরা অনায়াসে এখানের শীত সহ্য করিতে পারি। যদিও কোন শিক্ষার্থী যুবক আসিতে ইচ্ছুক হন তবে যত শীঘ্র পারেন রওনা হইবেন। আমরা জুলাই মাসের প্রথমে দুইমাসের জন্য টোকিও হইতে কয়েক শত মাইল দূরস্থ অন্তর্দ্বীপে চলিয়া যাইব। এপ্রিল মাসের শেষে কি মে মাসের প্রথমে এখানে আসিতে পারিলে, আমরা ২।১ মাস তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যাইতে পারিব। নতুবা বিদেশে অপরিচিত স্থানে অসুবিধা হইবার কথা। একজনের আসা ঠিক হইলে তিনি কোন খবরের কাগজে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে অন্যান্য ছাত্রেরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন। একসঙ্গে কয়েকজন আসিতে পারিলে সমুদ্রপথে সুখে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিবেন। কেহ যেন অধিকসংখ্যক ধুতি চাদর না আনেন। বৎসরের অধিকাংশ সময় গরম পোষাকের আবশ্যক। উপযুক্ত সময়ে খবর দিলে ইয়াকোহামা হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারিব। রওয়ানা হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে তারিখ ও জাহাজাদির নাম দেশ হইতে লিখিলে বা নাগাসাকি কি কোবী হইতে টেলিগ্রাম করিলেই যথাসময়ে সংবাদ পাইতে পারিব। আশা করি, অনেকেই আসিতে চেষ্টা করিবেন। সকলেই যেন স্ব স্ব ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট সঙ্গে

আনেন। প্রায় সকল বিভাগেই বিজ্ঞানের আবশ্যক হইবে; বিশেষতঃ Chemistry বিভাগে যাঁহারা আসিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আসার পূর্ব্বে Chemistry খুব ভাল রকম পড়িতে চেষ্টা করিবেন।

১৭ই মাঘ। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট 'জিম্ব' জাপানে রাজত্ব করিতেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছেন। এত দীর্ঘকাল একই রাজবংশ সিংহাসনে আরূঢ় থাকিতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশীয়েরা সাধারণতঃ সম্রাটকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, এমন কি শিক্ষিত যুবকগণও তাঁহাব ভ্রম বা দোষ সহজে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বর্ত্তমান সম্রাটেব পূর্ব্বে দুই শত বৎসর কি ততোধিককাল সম্রাটগণ নামমাত্র সিংহাসনে ছিলেন। ক্ষুদ্র জাপান প্রায় দুইশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের নিকট হইতে নামে মাত্র কর পাইয়াই সম্রাটগণ সন্তুষ্ট পাকিতেন। ঐ সমুদয় ক্ষুদ্র রাজাদিগের সঙ্গে সম্রাটের কোন সম্পর্ক ছিলনা; সম্রাটগণের মন্ত্রী "তকো গাওয়া"দের নিকট হইতে তাঁহারা সামান্য কর প্রাপ্ত হইতেন। 'তকো গাওয়া' বংশই সম্রাটের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অধীনস্থ রাজাদের সম্বন্ধ ছিল এবং সর্ব্ববিধ বাজকীয ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিবার ক্ষমতা সম্রাটগণের ছিল না। ৩২ বৎসব পূর্ব্বে অদ্য তারিখে বর্ত্তমান সম্রাটের পিতার মৃত্যু হয়, এই উপলক্ষে আজ আমাদের ছুটী। তৎপর সম্রাট তকোগাওয়াদের নিকট হইতে সমুদয় ক্ষমতা নিজ হস্তে আনিতে চেষ্টা কবেন, তাহাতে দুইদলে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হয়। অবশেষে তকোগাওবা বহুলক্ষ টাকা মূল্যের ধান্যপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ রাজকীয় ক্ষমতা বর্ত্তমান সম্রাটের হস্তে প্রত্যার্পণ করেন। অবশেষে সম্রাট অধীনস্থ রাজাদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে সাধারণ মার্ক্ইস, কাউণ্ট, বেরণ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য এই উপাধিগুলি

ইংলণ্ড হইতে আমদানী নহে, ইহাদের চীনদেশীয় নাম আছে, সাধারণ লোকে কাউণ্ট, বেরণ ইত্যাদি বুঝে না, সুবিধার জন্য ঠিক ইংরাজী উপাধি-গুলি বিদেশীয় ভাষায় লিখা হয়। 'সামুরায়' নামে একশ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের 'নাইট'দের ন্যায়, ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের সহায় ছিলেন। 'সমর' শব্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, বলা যায় না; বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোন কোন শব্দ এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সম্রাট সর্ব্ববিধ শ্রেণী ধ্বংস করিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় জাপানবাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—Common and noblemen। চীন-জাপানযুদ্ধে যখন কোনও সেনাপতির জামাতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কন্যা বীরের ন্যায় স্বামীর যুদ্ধে পতন সংবাদ অবগত হইয়া স্বহস্তে বক্ষে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তখনকার সংবাদপত্রগুলি এই ঘটনা উপলক্ষে এখনও সামুরায় শৌর্য্যবীর্য্য লোপ পায় নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল।

সম্রাটের নিজহস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার দিন হইতে এক সংবৎ প্রচলিত হইয়াছে; তাহাই আজকাল জাপানে প্রচলিত। ১লা জানুয়ারী হইতে ৩২শে সেইজী আরম্ভ হইয়াছে। তখনই রাজধানী কিয়োটু হইতে টোকিও আসিয়াছে। প্রায় ২০ বৎসরকাল মন্ত্রীসভার সাহায্যে সম্রাট দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৎপর ২১ সেইজিতে পার্লামেণ্ট সহ বর্ত্তমান শাসন প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। পার্লামেণ্টে ইংলণ্ডের ন্যায় দুই বিভাগ, কিন্তু দুই গৃহেরই তুল্য ক্ষমতা, যে কোন গৃহে আইনের পাণ্ডুলিপি, বাজেট প্রভৃতি প্রথম উপস্থিত করা যায়। মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্টের অধীন নহে, ইহা সম্রাটের অধীন; তিনি সর্ব্বদা মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যখন মন্ত্রীগণ কোনও আইন বা বাজেট পার্লামেণ্টের স্বপক্ষাবলম্বী অল্পসংখ্যক সভ্য থাকাহেতু পাশ করাইতে অক্ষম হন, তখন পার্লামেণ্ট মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ

করিতে বাধ্য হন। শতবৎসর হইতে কার্য্যতঃ গভর্ণমেণ্ট কোন রাজনৈতিক-দলের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন ; জাপানে প্রধানতঃ উদারনৈতিক (Liberal) ও উন্নতিশীল (Progressive) এই দুই রাজনৈতিক দল। নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, দুই দলেরই উন্নতি ও সংস্কারের দিকে দৃষ্টি। তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে পার্থক্য আছে। এই দুই দলে বিবাদ থাকাতেই কোনও প্রধান রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধবিহীন মন্ত্রীগণ এতদিন কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গত জুলাই মাসে এই দুই দল একত্র মিশ্রিত হইয়া 'কনষ্টিটিউশনেল' দল নামে অভিহিত হইয়াছে। তখন মার্কুইস্ ইটো প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি মন্ত্রীসভা গঠনের ভার উক্তদলের নেতাদের হস্তে অর্পন করিতে সম্রাটকে উপদেশ দিয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। মার্কুইস্ ইটো জাপানের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি উক্ত উদারনৈতিক কিম্বা উন্নতিশীল দলভুক্ত নহেন। C an party নামে তাঁহার এক দল আছে, সে দল তত ক্ষমতাপন্ন নহে। তিনি চীন জাপান যুদ্ধের সময়েও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভের পর কাউণ্ট হইতে মার্কুইস্ উপাধিতে ভূষিত হন্। তৎপর কাউণ্ট অকুমা উন্নতিশীলদলের প্রধান মন্ত্রীরূপে উদারনৈতিক দলের নেতা কাউণ্ট ইতাগাফির (Home Minister) সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন ; তখনও সম্রাটের বিশেষ আদেশে দল-বহিভূর্ত তিন জন মন্ত্রী রহিয়া যান। কাউণ্ট অকুমা অতি উপযুক্ত লোক ; আপন ক্ষমতাতে সামান্য অবস্থা হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কোনও সময় শত্রুদলের অস্ত্রাঘাতে তিনি এক পা হারাইয়াছেন। এখনও তিনি সাম্রাজ্ঞীর দত্ত কাঠনির্ম্মিত পদের সাহায্যে চলিয়া থাকেন। তিনি রাজনীতিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার শাসনকালে বিদেশীয় রাজাদের সঙ্গে নূতন সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ এই সন্ধির বহিভূর্ত। ব্রিটীশ

[illegible] [illegible] উদ্দেশ্য সাধনমানসে . ভারতবাসীকে এই সন্ধির [illegible] করেন নাই, তাহা বিদিত নাই; কিন্তু ফলস্বরূপ ভারতীয় বণিকদিগকে বেশী কর দিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত সন্ধিবন্দর ভিন্ন অন্যত্র বিদেশীয়দিগের থাকিতে হইলে বা ভ্রমণার্থ যাইতে হইলে বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের টোকিওতে বাসের জন্য কোনও ভদ্রলোক অনুমতি গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাস হইতে বিনা অনুমতিতে সকলে জাপানের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিবে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ জাপানে বানিজ্য করিতেন, তাহাদের দ্বারা কতকগুলি জাপানবাসী খৃষ্টান হইযাছিল। পাছে তাহাদের রাজ্যধ্বংস হয়, এই ভযে জাপান সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত ও বিদেশীয়দিগকে ভয় করিত। তকোগাওয়া গভর্ণমেণ্ট প্রায় দুইশত বৎসব পূর্ব্বে বিদেশীয়দের বানিজ্য বন্ধ করিয়া দেয, এবং বিদেশীয ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী প্রায় দুই হাজার পুরুষ রমণী ও বালক বালিকাকে হত্যা করিয়া বির্দেশীয়দের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ফেলে। আজ আর জাপান অন্যান্য শক্তিকে ভয় করিযা লুক্কায়িত নহে। নিজ শক্তি বুঝিয়া আজ সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিতে বসিয়াছে।

জাপানী লোক বড় রাজভক্ত। জাপানে কোনদিন সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইতে পারে, এ কথা সাধারণতঃ কোন ছাত্র বা ভদ্র-লোক বিশ্বাস করেন না; ইহা একপ্রকার অসম্ভব মনে করেন। সম্রাট-সম্পর্কীয় যে কোন বিষয় কোন সংবাদপত্র বা ভদ্রলোক সমালোচনা করিতে নিতান্ত নারাজ। যুদ্ধের ব্যযস্বরূপ চীন হইতে জাপান যে ৩০ কোটী ইয়েন (আমাদের ৪৫ কোটী টাকা) পাইয়াছিল, তাহা হইতে ২০ লক্ষ ইয়েন সেদিন সম্রাটকে দেওযা হইয়াছে। কযেকমাস পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী (Progressive) মিঃ অজাকি কোনও সভাতে বক্তৃতা-

কালে বলিয়াছিলেন, "জাপানী লোক গুণ অপেক্ষা টাকার অধিক আদর করে; তাহারা বড় টাকার ভক্ত; যদি কোনদিন জাপানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত হয়, তাহা হইলে জাপানী লোক সম্পত্তিশালী লোককে সভাপতি মনোনীত করিবে।" এইরূপ বাক্য-প্রয়োগের ফলস্বরূপ তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তৎপর উক্ত পদে মন্ত্রীনিয়োগকালে উদারনৈতিক দল ও উন্নতিশীল দলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, যদিও তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন, তথাপি ভিতরে ভিতরে তুল্য ক্ষমতা রাখিতে সকলেরই চেষ্টা ছিল। অধিকাংশের মতানুসারে একজন উন্নতিশীলদলের লোক শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে উদারনৈতিকদলের নেতা কাউণ্ট ইত্যাদি অন্য তিনজন স্বদলের মন্ত্রীসহ পদত্যাগের আবেদন প্রদান করেন। কাউণ্ট অকুমাকে (প্রধানমন্ত্রী) সম্রাট নূতন মন্ত্রীনিযুক্তির অনুমতি শীঘ্র না দেওয়ায় উন্নতিশীলদলের মন্ত্রীগণসহ প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। কাজে কাজেই মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন Constitutional দলও ভঙ্গ হইয়া যায়। তৎপর গত নবেম্বর মাসে চীন জাপান যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মার্কুইস্ ইয়ামাগাডা মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে প্রধান দুই দলের কোন সম্পর্ক ছিলনা। তিনি কোন দলের সাহায্য ব্যতীত শাসন করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন দলের লোককে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই কোন দলের সাহায্য ব্যতীত কর-বৃদ্ধি প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয় বিলগুলি পার্লামেণ্টে পাশ করান অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া, উদারনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখনও উদারনৈতিক দলের যোগে কার্য্য করিতেছেন। কার্য্যতঃ সম্প্রতি জাপানে Party Government প্রচলিত।

(খ) (সঞ্জীবনী, ২৯শে আষাঢ় ১৩০৬ সাল)

জাপান-প্রবাসীর পত্র

টোকিও, ২৬ শে মে, ১৮৯৯।

আগ্নেয়গিরির দেশ।

টোকিও এক বৃহৎ সহর। লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। ইহার এক-দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের শাখা টোকিও উপসাগর। এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহরের এক প্রান্তদেশ দিযা মৃদু মন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। ৮০ মাইল দূরে 'ফুজি' আগ্নেয়গিরি, ইহাই জাপানে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত; উচ্চতা ১৩ হাজার ফিট। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে একবার অগ্নি উদগীরণ করিযাছিল, এখনও শিখর দেশ হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে, আবার প্রজ্জ্বলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কখন কি হয় তাহার স্থিরতা নাই। এখানকার কোন কোন স্থান হইতে শিখর দেখিতে পাওযা যায, ইহার ন্যায সুন্দর পর্ব্বত আর কোথাও নাই। শুণ্ডাকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইযা উঠিযাছে, কোথাযও বৃহৎ বৃক্ষাদি দেখিতে পাওযা যায না। জাপানের সংবাদপত্রাদিতে ও নানা দ্রব্যাদিতে যথায তথায ফুজির চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায। নিকটে প্রায় ৭০টা নির্ব্বাপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নেয পাহাড় আছে; তাই ভূমিকম্পের মাত্রাটা একটু অধিক। পূর্ব্বে আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল বা এখনও অনেকের যেরূপ বিশ্বাস আছে, সেইরূপ ভূমিকম্প জাপানে দেখিতে পাইলাম না। মাঝে মাঝে সামান্য কম্প অনুভূত হয, তাহাতে ভযের কোন কারণ নাই, একদিন ভূমিকম্পের সময একটি বালক বলিল যে, এরূপ কম্পন তাহার জীবনে দেখে নাই, কিন্তু ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর নিকট তাহা অতি সামান্যই বোধ হইল।

—ভূমিকম্প অপেক্ষা অগ্নির ভয় বেশী—

জাপানীরা ভূমিকম্প অপেক্ষা অগ্নিকেই অধিক ভয় করে এবং ইহার ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ ও খোলার দ্বারা নির্ম্মিত, কেবল খুব ধনী ও গবর্ণমেণ্টের বাড়ী ও আফিস বিদ্যালয়াদি ইষ্টক নির্ম্মিত। প্রায় সকল মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীতেই এক একখানি ক্ষুদ্র অদহ্যমান গৃহ আছে। ধনী দরিদ্র সকলের গৃহই প্রায় এক প্রকার উপাদানে গঠিত। ছাদগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর, আমাদের দেশের ন্যায় দ্বিচালা বা চারিচালা বিশিষ্ট। খোলাগুলি বেশ সুন্দর বিস্তৃত। দেওয়ালগুলি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। টোকিওতে দুই একখানা খড়ের ঘরও দৃষ্ট হয়। নিক্কোতে অধিকাংশ গৃহই খড়ের ছাউনি। আশিওতে কাঠের ছাউনি। ইহা ৮ ইঞ্চি পুরু ও ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেরেক দ্বারা বদ্ধ। গরীব লোক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সঙ্কীর্ণ তক্তাগুলি স্বস্থানে আবদ্ধ রাখে। কাষ্ঠ জাপানের প্রধান সম্বল। এমন কাজ নাই যাহাতে তাহারা কাষ্ঠ ব্যবহার না করে। মেছুনীরা মাছ বিক্রির সময় কদলীপত্রের পরিবর্ত্তে কাঠের পাতলা কাগজ ব্যবহার করে। গৃহের ভিতরের দিক্ অপেক্ষাকৃত সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত গৃহের মেজে খড়ের গদি বিস্তৃত, তাহা মাদুর দ্বারা আবৃত। ভিতরের দিকের দেওয়ালগুলি খড ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু এরূপে রং করা হয় যে খড় বা মৃত্তিকা বলিয়া টের পাওয়া যায় না। কাগজ অতি পাতলা ও শক্ত। কাঠের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইচ্ছামত দ্বারগুলি একদিকে সরান যায় অথবা খুলিয়া ফেলা যায়। বাহিরের দিকে ঐরূপ কাঠের দ্বার রাত্রিতে বন্ধ করা হয়। দিনের বেলা পার্শ্বস্থ বাক্সে পুরিয়া রাখা হয়। সকল সময় ঐ সকল দ্বারে কুলুপ দেওয়া হয় না। অনায়াসে বাহির হইতে খোলা যায়। আমাদের দেশের ন্যায় চোর ডাকাত থাকিলে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত। তবে

জাপানীদের গৃহে সাধারণতঃ চুরি করার উপযুক্ত মূল্যবান দ্রব্য থাকেও না। ভদ্রলোকদের বাড়ীর এক এক কামরা হইতে অন্য কামরা কাগজে দ্বারা পৃথক করা হয়। কিন্তু বোর্ডিং হাউসের প্রত্যেক কক্ষ মাটীর দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন রাস্তায় fire-proof ভিন্ন গৃহ-নির্ম্মাণের অনুমতি নাই। শীতকালেই আগুণের ভয় বেশী। গরীব লোকে শীতের তাড়নায় অনেক সময়ে রাত্রিতে আগুণ রাখিতে বাধ্য হয়, তাহা হইতেও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। ধনীলোক প্রতিবেশীদিগকে সাবধান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করে, তাহারা দিন রাত্রি দুই কাঠের টুকরা বাজাইতে বাজাইতে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই শব্দ শুনিলেই সকলের আগুণের কথা মনে হয়। টোকিও সহর ১৫টী বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক বা ততোধিক উচ্চমঞ্চ আছে, তথা হইতে প্রহরীগণ সর্ব্বদা আগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আগুণ লাগিলে তৎক্ষণাৎ সকল স্থানে টেলিফোঁ দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়। আগুণ দূরে, নিকটে বা অতি নিকটে লাগিয়াছে কিনা, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ঘণ্টা বাজাইয়া সাধারণকে তাহা জানানো হয়। আগুণ নির্ব্বাপিত হইলে গৃহে বসিয়া সকলে তাহা ঘণ্টা-ধ্বনিতে জানিতে পারে। পুলিশষ্টেশনাদিতে কোথায় আগুন লাগিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাই ঘণ্টা শুনিলে লোক যেন পাগলের ন্যায় পুলিশ-থানা অভিমুখে দৌড়িয়া যায়।

—মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা—

রাস্তাগুলি তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। স্থানে স্থানে তড়িত আলো আছে বটে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির আলোকের বন্দোবস্ত অতি অল্প। প্রায় সকল ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকের বাড়ীতে দোকান ও বোর্ডিং হাউসের সম্মুখে নিজেদের আলোকের বন্দোবস্ত আছে। তাহাদ্বারাই রাস্তা যাহা

কিছু আলোকিত হয়। অনেক স্থলে গৃহস্থেরাই নিজ নিজ পার্শ্বস্থ রাস্তা পরিষ্কার করে ও তাহাতে জল দেয়।

—ঘোড়ার গাড়ী ও মানুষটানা গাড়ী—

যাহাদের ঘোড়ার গাড়ী আছে, তাহাদিগকে খুব ধনী বলিয়া বুঝিতে হইবে, সচরাচর ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাড়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ী নাই, ট্রামগাড়ী আছে। প্রথম শ্রেণীর গাড়ী প্রতি অর্দ্ধ-মাইল দুই পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর দেড় পয়সা। আর সবই 'জিনরিকসা' অর্থাৎ মানবশক্তি-চালিত গাড়ী। আমাদের দেশের ধনীলোক যেমন দুই ঘোড়া, চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত করে, এখানেও সেইরূপ দুই মানব তিন মানব-চালিত 'জিনরিকসা' ব্যবহার করে। এখানে ফেরিওয়ালা, মুটে প্রভৃতি প্রায় সকলেই দুই চাকার ক্ষুদ্র গাড়ী ব্যবহার করে। প্রায় কেহই মস্তকে মালবহন করে না। তবে দুই এক জনকে কাঁধে করিয়া মালবহন করিতে দেখা যায়। গোয়ালারা বোতলে পুরিয়া দুধ আনে। তাহাদের গাড়ী একটী ক্ষুদ্র বাক্স বিশেষ, তাহাতে দুইখানা চাকা আছে। আমাদের দেশের মুটেদের এরূপ গাড়ী ব্যবহার করা উচিত, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্রমের লাঘব হইবে অথচ একজনে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যাদি অনায়াসে বহন করিতে পারে।

—ফেরিওয়ালা—

এখানে প্রায় সকল রকমের ফেরিওয়ালা আছে, তন্মধ্যে দুই একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা রকমের পুস্তক লইয়া আসিবে, সপ্তাহকালের জন্য উপন্যাসাদি ভাড়া দিয়া যাইবে, আবার নির্দ্দিষ্টদিনে তাহা ফিরাইয়া লইবার জন্য তোমার বাড়ী আসিবে। জাপানীরা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও চিত্র খুব ভালবাসে। তাহাদের ক্ষুদ্র বাড়ী যত দূর সম্ভব নানা প্রকারে গাছপালাদ্বারা সজ্জিত রাখে। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রকমের টবে

বসান চারাগাছ ও ফুল রাখে, তাই সর্ব্বদা চারাগাছ ও ফুলের ফেরিওয়ালা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দর্জ্জিরা নানাবিধ কাপড়ের নমুনা লইয়া বাড়ী বাড়ী আসে ও মাপ লইয়া পোষাক তৈয়ারী করিয়া বাসায় দিয়া যায়। সাধারণতঃ মেয়েরা নিজেদের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনের দেশী পোষাক তৈয়ারী করে; সাধারণ পোষাক গৃহস্থেরা বড় খরিদ করেনা। প্রায় সকল মেয়েই কিছু না কিছু সেলাই জানে। অনেক সময় তাহারা মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করে, ছেলেরাও স্ব স্ব মা ভগ্নির তৈয়ারী পোষাক ব্যবহার করিতে গৌরব মনে করে। রেলওয়ে ষ্টেশনে তৈয়ারী ভাত তবকারী পাওয়া যায়। আহার্য্য কোন দ্রব্যের জন্য বাড়ীর বাইর হয় না।

—ডাকঘরের কথা—

টোকিওর প্রত্যেক বিভাগে এক দুই বা ততোধিক পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। প্রতিদিন প্রায় দশ বারবার ডাক বিলি করা হয়; প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস খোলা থাকে। মনি অর্ডারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। মনিঅর্ডারের টাকা পিয়ন বাড়ী লইয়া আসে না। যত কম টাকাই হউক না কেন পোষ্টাফিস হইতে আনিতে হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র, তাহাতে আবার সৈন্য—বিশেষতঃ যুদ্ধ জাহাজাদির ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে হইতেছে, তাই কিছুতেই আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান হইতেছেনা। এবার পোষ্টকার্ড এক পয়সা স্থলে দেড় পয়সা ও চিঠি দুই পয়সা স্থলে তিন পয়সা করা হইয়াছে; কিন্তু সংবাদ-পত্রের জন্য অৰ্দ্ধপয়সা।

—সংবাদ-পত্র—

খবরের কাগজের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। টোকিওতেই প্রায় ১৫।১৬ খানি দৈনিক কাগজ আছে।

তন্মধ্যে একখানি মাত্র ইংরেজী, অপর দুই তিন খানিতে প্রতিদিন দুই এক কলম ইংরেজী থাকে। এখানে দৈনিক কাগজের আদর খুব বেশী। সাপ্তাহিক কাগজ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য সহরে অনেকগুলি দৈনিক কাগজ আছে, কোচী ও ইয়াকোহামা সহরে ইংরেজী কাগজের সংখ্যা অনেক অধিক। সাধারণ মুটে মজুর পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে; গাড়োয়ানদিগকে বিশ্রাম সময়ে নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়িতে দেখা যায়। চাকরাণীগণও ইহা হইতে বাদ যায় না। সাময়িক কাগজের সংখ্যা অনেক অধিক। টোকিওতে প্রায় ২০০ দুইশত হইবে।

—টেলি ফোঁ—

টেলিফোঁর ব্যবহার এখানে অনেক অধিক, যথাতথা—হোটেল, কলেজ, বণিকদের দোকানে প্রায় সর্ব্বত্রই টেলিফোঁ দেখিতে পাওয়া যায়। পোষ্টাফিসে টেলিফোঁর বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, পাঁচ পয়সা দিলে ৫মিনিটের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে পারা যায়। টোকিও হইতে 'ওশাখা' পর্য্যন্ত টেলিফোঁ খোলা হইয়াছে; দূরত্ব প্রায় তিন শত মাইল।

Mr. Sho Nemsto জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতের শিল্প-বাণিজ্য পরিদর্শন করিতে মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এখানকার পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য, দুই একদিন মধ্যেই বোম্বে রওয়ানা হইবেন; তথা হইতে কলিকাতা যাইবেন।

(৮) 'জাপান-প্রবাসীর পত্র', আশিও, নিকো (বৃহস্পতিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন) (সঞ্জীবনী, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

১লা এপ্রিল হইতে এক সপ্তাহের জন্য বসন্তাবকাশ। আমাদের বিভাগের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর সকল ছাত্র ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় খনির জরিপ (mine survey) করিতে ট্রেনে প্রসিদ্ধ আশিও

তাম্রখনিতে গিয়াছিলাম। জাপানীরা সকলেই তিনবার ভাত খায়। এজন্য আহারের সময় হোটেলওয়ালারা ষ্টেসনগুলিতে কাঠের বাক্সে করিয়া ভাত তরকারি বিক্রয় করে। প্রত্যেক ছাত্র এক এক বাক্স ক্রয় করিয়া ট্রেনে বসিয়াই আহার করিল; আহার করিবার যন্ত্র কাঠের শলাকা প্রভৃতি বাক্সেই থাকে। ট্রেন আমাদের দেশের ট্রেণ অপেক্ষা মৃদুগতিতে চলে বলিয়া মনে হইল। মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী ও রিটার্ণ টিকেট নাই; তবে তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চগুলি মাদুর দ্বারা আবৃত। গাড়ী জাপানীদ্বারাই চালিত, কোন বিদেশীয় কর্ম্মচারী নাই। প্রায় ১২॥ টায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আশিওর দিকে রওয়ানা হইলাম, ইহা নিক্কো হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরস্থিত। সমুদ্র হইতে ৪৩৭০ ফিট উচ্চ এক পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। কয়েক মাইল আসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে খনির মালিকের এক আফিসে আমাদের সকল দ্রব্যাদি পাহাড়ের উপরে লওয়ার জন্য রাখিয়া দিলাম। দ্রব্যাদি বহনের অতি উত্তম বন্দোবস্ত রহিয়াছে; মোটা লৌহশিকল কাঠের স্তম্ভের উপর দিয়া পাহাড়ের অপরদিকে পৌছিয়া আবার এখানে আসিয়াছে; দুই লাইনের মধ্যে কয়েক ফিট ব্যবধান। শিকলের অগ্রভাগ সংযুক্ত ও সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। ইহাতে কয়েক গজ অন্তর অন্তর আসন ঝুলান রহিয়াছে, তাহাতে দ্রব্যাদি দিতে হয়; এদিকে যে আসনে মাল রাখা যায়, অন্যদিকে পৌছিলে সেই মাল রাখিয়া, তাহাতে অন্য জিনিস চাপাইয়া দেয়, তাহা এদিকে পৌছে। এরূপভাবে অনবরত শিকল ঘুরিতেছে, আর দ্রব্যাদি একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছে। প্রত্যেক আসনে দুইমণ পরিমাণ মাল রাখিতে পারা যায়, ইহা দ্বারাই খনি হইতে তাম্র আনয়ন করে। পাহাড় হইতে যে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই কাঠের বাক্সে বা লোহার পাইপে নিয়মিত রূপে চালাইয়া ঐ কল চালাইতেছে। পথে আরও

কয়েকটা ক্ষুদ্র ময়দার কল জলশক্তিতে চালাইতে দেখিলাম। ইহাদের চাকাগুলিও কাঠের নির্ম্মিত ; তাই অতি অল্পব্যয়ে কার্য্য সাধিত হই-তেছে। বহুকষ্টে প্রায় দুইঘণ্টায় পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলাম, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়াছি এবং প্রচুর পরিমাণে বরফ (Snow) দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিতে পারিয়াছি। আর এক ঘণ্টায় খনির সত্বাধিকারীর অন্য আফিসে পৌছিলাম। তথায় আমাদের জন্য দুইখানা ট্রামগাড়ী ও একখানা মালগাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সাধারণতঃ পদব্রজে যাইতে হয়, কিন্তু আমাদের জন্য এই বিশেষ বন্দোবস্ত। লোকে অশ্বপৃষ্ঠে পাহাড়ের উপর মাল বহন করে। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে মিঠাইর দোকান আছে, কোন কোন স্থানে রসাল ফল পাওয়া যায়। পাহাড় হইতে অসংখ্য পরি-ষ্কৃত জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সন্ধ্যার পর গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। সকলে এক হোটেলে গেলাম, গৃহে পৌছিবামাত্র হোটেলের ভৃত্যগণ আসিয়া অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিল। নির্দ্দিষ্ট কামরাতে পৌছিলে আমাদের জন্য চা ও মিঠাই আনিল ; প্রতিদিন কার্য্যক্ষেত্র হইতে আসিলে উহারা এরূপ ব্যবহার করিত। এই চা ও মিঠাইর জন্য অন্য কোনরূপ মূল্য চাহেনা। তবে সকলেই চা'র জন্য কতক পুরস্কার দিয়া থাকে। কোন হোটেলে একবার মাত্র আহার করিলেও চা'র বাবদে কিছু দিতে হয়। আমরা প্রত্যেকে প্রায় একটাকা চা'র জন্য দিয়াছি। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা আমাদিগকে এক একখানা রুমাল দিয়া ধন্যবাদ করিয়াছে। প্রাতে ও রাত্রে হোটেলে আহার করিতাম। এবং মাধ্যাহ্নিক আহারের দ্রব্যাদি খনিতে পাঠাইয়া দিত, আমরা খনিতে বসিয়াই আহার করিতাম। সামান্য হোটেলের বন্দোবস্ত বেশ, জাপানের সকলস্থানে প্রায় একরূপই বন্দোবস্ত। ১ ফুট দৈর্ঘ্য, ১ ফুট বিস্তার ও ৮।৯ ইঞ্চি উচ্চতা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিষ্কার টেবিলে হোটেলের ভৃত্যেরা ভাত ভিন্ন সব আহারীয় সামগ্রী সজ্জিত

করিয়া প্রত্যেকের জন্য আনিবে এবং পৃথক বৃহৎ গোলাকৃতি কাঠের বাক্সে করিয়া ভাত আনিবে ও যখন যাহার আবশ্যক তখন তাহাকে দিবে। বোর্ডিংএ প্রত্যেকের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্সে ভাত দিয়া থাকে, কারণ ভাত দিবার জন্য প্রত্যেকের ঘরে এক একজন ভৃত্য রাখা অসম্ভব। নিজেই কাঠের চামচ দিয়া ভাত লইতে হয়। এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ব্যবহার করে; জাপানী লোক কাঠের দুই শলাকা দ্বারা আহার করে, তাহারা ইহাতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; আমি তাহা দ্বারা আহার করিতে পারিনা।

খনির ভিতরে দিনরাত্রি,, শীতগ্রীষ্ম, ঝড়বৃষ্টি সকলই সমান। সদা অন্ধকারপূর্ণ, টপ টপ করিয়া উপর হইতে অনেক স্থানে জল ঝরিতেছে নীচে কাদা, খনিতে প্রবেশ করিতে প্রত্যেককে ল্যাম্প, মোমবাতি, দিয়াশলাই লইয়া প্রবেশ করিতে হয়। আলোক ভিন্ন কিছু দেখিবার সাধ্য নাই। খনির মধ্যস্থল অতি সংকীর্ণ, কয়েক ফিট মাত্র প্রশস্ত, উচ্চতাও তদ্রূপ, সকল স্থানে সোজা হইয়া যাইবার উপায় নাই, বিশেষতঃ আমাকে অনেক স্থানেই বক্র হইতে হইয়াছে। জাপানীরা সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি, তাহাদের পক্ষে বেশ সুবিধা। আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া জরিপ আরম্ভ করি। আমাদের দল এক উপরের লেভেল জরিপ করে। তাহা সমভূমিস্থ লেভেল হইতে প্রায় ৬০ ফিট উচ্চ। কোন কোন লেভেল দুই শত ফিট উচ্চ। নীচের দিকেও সেইরূপ লেভেল আছে। Winzes এর ভিতর দিয়া এক লেভেল হইতে অন্য লেভেলে যাইতে হয়। Levels গুলি horizontal excavations এবং Winzeগুলি উপরের ও নীচের লেভেলগুলি সংযুক্ত করিতেছে। এই Winze গুলিও একসময়ে আকরে পূর্ণ ছিল।৷ একণে উপরে যাতায়াতের ও উপর হইতে নীচে আকর ফেলিবার রাস্তারূপে ব্যবহার হয়। Winze এর ভিতর ladders

দিয়া উপরে উঠিতে হয়, তাহাও আবার শুষ্ক নহে, অনেক স্থানে পিচ্ছিল, এক হাতে আলো ধরিতে হয়; এমন কি Hanging Compass দ্বারা Winzeও জরিপ করিতে হইয়াছে। Winze এর জরিপ অতি কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একবার হস্ত ladder হইতে চ্যুত হইলে প্রাণের আশা খুব কম। এক হাতে আলো, অন্য হাতে শিকল রাখিয়া মাপিতে হইয়াছে। দুইপ্রকার জরিপ করি,—এক Hanging Compass (German Dial), অন্য Theodolite দিয়া। জাপানে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত জরিপই প্রচলিত, কারণ ইহা অতি সহজ, যন্ত্রাদিও অতি অল্পব্যয়সাধ্য এবং অল্প সময়ে অনেক স্থান জরিপ করিতে পারা যায়, যদিও ইহা Theodolite জরিপের ন্যায় শুদ্ধ নহে। Theodolite জরিপ অতি শুদ্ধ, কিন্তু যন্ত্রাদি জটিল ও ব্যয়সাধ্য। বক্র levels এ জরিপ করিতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু সোজাস্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত ষ্টেসন নেওয়া যায়, Hanging Compassএ তাহা করিলে অনেক ভুল হয়। পতাকার পরিবর্ত্তে আলোক ব্যবহার করিতে হয়।

এই খনি পৃথিবীতে তৃতীয় তাম্রখনি; ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই খনি পাওয়া গিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা একটি সামান্য মাইন 'Mine' ছিল; নূতন মালিক মিঃ ফুরুগাওয়া সামান্য টাকাতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ক্রয় করিয়াছেন। তিনি একজন সামান্য দরিদ্র লোক ছিলেন, ক্রমে সামান্য অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টায় জাপানে প্রসিদ্ধ ধনীদের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন; তাঁহার অনেকগুলি খনি আছে। আশিও খনির পরিমাণফল ২৫ বর্গমাইল; বহু মাইল রেলপথ স্থাপন করিতে হইয়াছে; এই খনির কাজে ১২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ইন্‌জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন, প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার লোক খনির ভিতরে কাজ করে, তাহাদের দৈনিক বেতন সাধারণতঃ ৫০ ইয়েন, আমাদের সাড়ে বার আনা। প্রতি-

মাসে প্রায় ১৬৬৬৫ মণ তাম্র উৎপন্ন হয়, খনির ভিতর যে জল প্রবাহিত হয় তাহাতেও প্রচুর তামা মিশ্রিত ; উক্ত জলে লৌহ মিশ্রিত করিয়া খনির ভিতরে তামা জমা করে, তাহা হইতেই মাসে ১২৫ মণ তামা উৎপন্ন হয়। এখানে তিনটী Dressing works আছে। Dressing অর্থাৎ মূল্যবান্ আকর পৃথক করা ; উক্ত কাজে প্রায় ৮০০ শত লোক নিযুক্ত আছে। পুরুষদের বেতন ৩৪ ইয়েন, সাড়ে আটআনা, স্ত্রীলোকের বেতন সাড়ে তিনআনা চারিআনা, কাহারও বেতন ২৫ ইয়েনের বেশী নাই। Dressing নানারকম। যখন মূল্যবান্ আকর পৃথক্ করিবার সুবিধা নাই তখন গুড়ঁা করতঃ তাহা ধৌত করিয়া পৃথক করিতে হয়। উক্ত জল বিষাক্ত, চাষের প্রচুর অনিষ্ট করিয়াছে, তাই কৃষকদের আপত্তিতে জল পরিস্কার করিবার জন্য প্রায় ১২০০০ হাজার টাকা খরচ করিয়া কয়েকটা পুকুর খনন করিতে হইয়াছে। উক্ত পুকুর গুলিতে চূণ মিশ্রিত করিয়া জল পরিষ্কার করে, কিন্তু কিছুদিন অন্তর নীচের মাটী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একটা তাম্র বিশুদ্ধ করিবার কারখানা আছে, তাহাতে প্রায় ৫০০ শত লোক নিযুক্ত। এই কারখানাতে নানাবিধ কল কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অনেক কল চালাইতে জলশক্তি নিয়োজিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে গন্ধক ও আর্সেনিকের গন্ধে দাঁড়ান কষ্টকর ব্যাপার। এখানে যে তামা প্রস্তুত হইতেছে, তাহার প্রায় ৯৯ ভাগ বিশুদ্ধ তামা। সব তামাই জার্ম্মানীতে পাঠান হইতেছে।

জরিপের কাজ শেষ করিয়া নিক্কোতে ফিরিয়া আসি। এবার দুই-ঘণ্টায় পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি। নিক্কো প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য জাপানে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ শরৎকালে অতি মনোমুগ্ধকর নানা বর্ণের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটে চারিটা জলপ্রপাত আছে। প্রসিদ্ধ

Kegcn প্রপাতের উচ্চতা ১৬০ ফিট। তথা হইতে বেগবতী নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বতী নিক্কোর পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত স্রোতস্বতীর উপর প্রাচীন লোহিত বর্ণের সেতু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা প্রস্তর ও কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহা কেবল রাজা ও রাজপরি-বারের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণের জন্য পৃথক্ সেতু আছে। এখানকার দেবালয় জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা দেখিতে প্রতিদিন শত শত যাত্রী আসিতেছে। আমাদের দেশে লোকে যেরূপ গঙ্গাস্নানে যায় নিক্কোও সেইরূপ। নিক্কো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, তাই গ্রীষ্মের সময়ে অনেক লোক এখানে আসে। সমস্ত দেবালয় দেখিতে প্রায় দুইটাকা খরচ হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিনাখরচে দেখিতে দেয়। আমাদিগকে কলেজের নিদর্শনপত্র দেখাইতে হইয়াছে। সমস্ত দেবালয় প্রস্তুত করিতে প্রায় ১৩ বৎসর সময় লাগিয়াছে। সমস্তে প্রায় ৪০টী গৃহ, সমস্তই তাম্রের ছাউনি, কিনারায় ও উপরে স্বর্ণমণ্ডিত। জাপানে আর কোথাও এত সোনার কাজ নাই। ভিতরগুলি নানাপ্রকার স্বর্ণের কারুকার্য্য-শোভিত। অবশ্য আমাদের দেশের কারুকার্য্যের নিকট ইহা কিছুই নহে। তবে জাপানে আর কোথাও এরূপ ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়না। সহস্র-পাণি, ষড়্ভুজ, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানারকমের দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের দেবতার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। এমনকি অনেক দেবতা আমাদের দেশ হইতে এখানে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; যথা এক দেবতার নাম বজ্রপাণি; তাহা কখনও জাপানী নাম হইতে পারেনা। এক সিংহদ্বারে নিদ্রিত বিড়ালের প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, প্রাচীন কালের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না। দেবতার নিকট লোকে সাধারণতঃ পয়সা দেয় ও দুইহস্ত জোড় করিয়া

প্রণাম করে, ইহা দেখিয়া সহজেই দেশের কথা মনে হয়, ঠিক আমাদের দেশের মত, তাহারা প্রণাম করিবার সময় 'নাম, নাম' বলিয়া প্রণাম করে, তাহাতে সহজেই মনে হয় ইহা ভারত হইতে আসিয়াছে, আমাদের 'নম' তাহাদের 'নাম'।

অনেক বড় বড় প্রস্তর আছে, এক দেওয়ালে ২৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট বিস্তৃত একখণ্ড পাথর। এক দ্বারের স্তম্ভ ৩০ ফুট লম্বা ও পরিধি ১২ ফুট, ইহাও একখণ্ড প্রস্তর, ইহার উপরিভাগে ৫৫ ফুট লম্বা একখণ্ড প্রস্তর। অনেক রাজকুমারেরর স্মৃতিস্তম্ভ একখানা শ্লেট প্রস্তর ২২ ফুট দীর্ঘ, ১০ ফুট বিস্তৃত ও ২ ফুট গাঢ়; ইহাতে তাঁহার বিবরণ খোদিত আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষের পরিধি ৩৪ ফুট। অনেক প্রশস্ত কাঠের কপাট দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০ ফুট উচ্চ পঞ্চতলবিশিষ্ট মঞ্চ, ইহার ছাদ তাম্র ও স্বর্ণ নির্ম্মিত। এক আলোকাধারের একস্থানে তৈল রাখিতে হয়, তাহা হইতে ৩৬টা প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়। অন্য এক আলোকাধার হলণ্ড দেশ হইতে আনা হইয়াছে, ইহাতে প্রদীপ প্রজ্জলিত করিলে ঘুরিতে থাকে। সম্প্রতি বৃক্ষের মূল ইহাতে জড়াইয়া যাওয়াতে ঘুরে না। গৃহের ভিতর স্বর্ণ-নির্ম্মিত আলোকাধার প্রভৃতি আছে। জাপানীদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত জড়িত অনেক বিষয় এখানে আছে এবং প্রাচীন কালের ভাস্কর কার্য্যের নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায়। নিক্কোতে কাঠের কারুকার্য্য অতিসুন্দর; দৈনিক ব্যবহারের অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায় এবং তাহা অতি সস্তা। এখানে হোটেল অপেক্ষাকৃত ভাল, অনেকগুলি সাহেবী ধরণের হোটেল আছে। আমরা জাপানী হোটেলে ছিলাম; অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তিনখানা তোষকের মধ্যে উপরের তোষকখানা রেশমনির্ম্মিত। দৈনিক এক ইয়েন (আমাদের দেড় টাকা) দিতে হয়।

(৯) জাপানপ্রবাসীর পত্র।

সাদো, ২১শে জুলাই।

(সঞ্জীবনী ১৩০৬, ৫ই আশ্বিন)

১০ই জুলাই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেসনের দিন, এবার সম্রাটের স্বয়ং আসিবার কথা, তাই বিশেষ আয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে কন্‌ভোকেশন উপলক্ষে সম্রাট কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন নাই। ছাত্রদের ইউনিফরম পরিয়া আসিতে হইয়াছে এবং অধ্যাপক ও অন্যান্য সকলকে ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করিতে হইয়াছে। ফ্রগ কোট ভিন্ন সম্রাটের সম্মুখে কেহ যাইবার অধিকারী নহে, এমন কি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, দাঁড়াইতেও পারেনা। সম্রাজ্ঞীর সম্মুখেও ইউরোপীয় পোষাক ভিন্ন যাইবার রীতি নাই; প্রতিবৎসর সম্রাজ্ঞী তদীয় বাগানে ফুলের দৃশ্য দেখিবার জন্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করেন, তদুপলক্ষে গত বৎসর আমার জনৈক বন্ধুর মাতা ইউরোপীয় পোষাকের অভাবে স্বামীসঙ্গে রাজোদ্যানে যাইতে পারেন নাই। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, বিদেশীয় পোষাক জাপানে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে এতদিন ইংরেজ-সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও বিলাতী পোষাক ইহার এক চতুর্থাংশ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। জাপানীদের পোষাক অতিশয় ঢিলে, কাজকর্ম্ম বা ক্রীড়া ব্যায়ামাদির সময় সুবিধাজনক নহে, তাই সৈন্যদের ইউরোপীয় পোষাক, সকল ছাত্রেরই ইউরোপীয় ধরণের ইউনিফরম আছে: জাপানীরা অতিশয় রাজভক্ত, সম্রাট সিংহ-দ্বারে প্রবেশ না করিতেই ছাত্র ও অধ্যাপকগণ মাথা হইতে টুপি খুলিয়া ফেলিলেন; যখন দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন ছাত্রগণ অধোমুখে রহিল। আমার দেখিবার ইচ্ছা, তাই আমি সকলের অনুকরণ করিতে পারিলাম না; পূর্ব্বে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার রীতি ছিল। পুলিস

রাস্তায় সম্রাটের আগমনের পূর্ব্বে সকলকে টুপি খুলিতে আদেশ করিয়া থাকে, পাছে কেহ টুপি খুলিতে ভুলিয়া যায়। সম্রাটের আগমনের সময় সকলে টুপি লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত হয়। এই টুপির ব্যবহার নূতন, ইউরোপ হইতে আমদানি; তাই ইহার জন্য এত ব্যাকুলতা। সম্রাটকে ভালরূপ দেখিবার সুবিধা নাই, কাচ আটা গাড়ীর মধ্য দিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার পোষাকাদি সমস্তই ইউরোপীয়। ভারতের বড়লাটের ন্যায় সম্রাটের সঙ্গেও অশ্বারোহী সৈন্য আসে, আর কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম না। তবে বড়লাট যেমন স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে ভ্রমণ করেন বা যথাতথা গমন করেন, সম্রাটের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

এত রাজভক্তির দেশে, যে দেশের লোক সম্রাটকে দেবতাভাবে, অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহে, সেই দেশে অবরুদ্ধ গাড়ীতে এমনভাবে যাওয়া যেন কেমন দেখায়। সম্রাট 'হলে' প্রবেশ করিলেন, যাঁহারা এবার উপাধি পাইবেন, তাঁহারাই কেবল 'হলে' প্রবেশ করিতে পারিলেন; আর সকলে বাহিরে রহিল, কাজেই ভিতরে যাইতে পারিলাম না। সম্রাট প্রত্যেক কলেজের প্রত্যেক বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে স্বনামাঙ্কিত এক একটি ঘড়ি পারিতোষিক দিলেন। গৃহে কেবল সম্রাটের জন্য একখানা আসন ছিল। সম্রাট স্বয়ং প্রায় ২০ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে পারিতোষিক বিতরণাদি কার্য্য সমাপন করিলেন। নিঃশব্দে উপাধি বিতরণ কার্য্য শেষ হইল, বক্তৃতাদি কিছুই হইল না। সম্রাট নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। তৎপর বাহিরে সকল ছাত্রের সম্মুখে শিক্ষা-বিভাগের রাজমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রত্যেক কলেজের ডিরেক্টর বক্তৃতাদি করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দিলেন। ছাত্রদের জন্য প্রচুর পরিমাণে মিঠাই ও লেমোনেডের বন্দোবস্ত ছিল।

১১ই জুলাই হইতে বিশ্ববিদ্যালয় দুই মাসের ছুটী। খনিতে কাজ

শিখিতে দুই মাসের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। ১৩ই জুলাই প্রাতে ৬ টার সময় উয়েন ষ্টেশন হইতে রওয়ানা হইয়া বিকালে ৫টার সময় সমুদ্রতীরস্থ Naoctsu নামক স্থানে পৌছিলাম। রাস্তা পর্ব্বতাকীর্ণ, ক্রমে প্রায় দুইহাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিতে হইয়াছে; একস্থানে ২৬টী পাহাড়ের নীচে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঘন অন্ধকার স্থানে যাইতে হইবে, তাই সেই সময় গাড়ীতে আলো জ্বালা হইয়াছিল। উক্ত স্থানটী একটি ক্ষুদ্র সহর, বিশেষ কিছুই দেখিলাম না। প্রচুর পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর সূর্য্যকে সমুদ্রগহ্বরে ডুবিতে দেখিলাম। এ সকল অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় প্রচুর পরিমাণে তুষার পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে বরফ তৈয়ারী করিবার কল নাই, তবে শীতকালে যখন প্রচুর পরিমানে তুষার পতিত হয়, তখন বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর পূর্ণ করিয়া রাখে। তাহাই যথা সময়ে অল্প অল্প আনিয়া বিক্রয় করে। পাহাড়ের নিকটস্থ বড় বড় সকল ষ্টেশনেই বরফ কিনিতে পাওয়া যায়। টোকিওতে বরফ তৈয়ারী করিলেও প্রচুব প্রাকৃতিক বরফ আমদানী হয়।

পরদিন প্রাতে আহারান্তে ৬টার সময় কেরোসিন তৈলের কুপ দেখিতে রওয়ানা হইলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যেই কাশিবাজাকি নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। গন্তব্যস্থান ষ্টেশন হইতে ১০ মাইলের অধিক দূরে; তাই এক হোটেলে জিনিষাদি রাখিয়া 'জিনরিকসাতে' রওয়ানা হইলাম; পাহাড়ের পাদদেশে জিনরিক্সা রাখিয়া একজন পথপ্রদর্শকসহ পাহাড় আরোহণ করিতে লাগিলাম। অতিনিকটেই অনেকগুলি কুপ দেখিলাম এই স্থানটা কেরোসিনতৈলপরিপূর্ণ, প্রায় ৩০ টা কোম্পানি তৈলের কাজ করিতেছে, প্রত্যেক কোম্পানীরই অনেকগুলি কুপ আছে। এই তৈল খনন ও পরিস্কার করা খুব সহজ। প্রথমতঃ স্থান নির্দ্দিষ্ট করাই কঠিন কাজ; ভূতত্ত্ব-বিদ্যার বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তৎপর উচ্চস্থানে

কূপ খনন করা; কূপ বলাতে কাহার মনে কি ভাব আসিয়াছে, তাহা জানিনা, কূপগুলির ব্যাস সাধারণতঃ ৪।৫ ইঞ্চি মাত্র, গভীরতা ৭০০।৮০০ ফিট, কোন কোনটা আরও অধিক। গর্ত্তখনন যন্ত্র দ্বারা এই কূপগুলি খনন করা হয়, প্রস্তরের কাঠিন্যানুসারে প্রতিদিন ২০ হইতে ৩৬ ফিট খনন করিতে পারে, জলের কূয়া যেমন যে স্তরে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে সেইস্তরে পৌঁছিলে আপনাআপনি জল উঠিতে থাকে, সেইরূপ তৈলের স্তরে পৌঁছিলে, প্রবলবেগে ফোয়ারার ন্যায় তৈল উর্দ্ধে উত্থিত হয়; সময় সময় প্রথম অবস্থায় ভূমি হইতে ২০।৩০ ফুট উপরে উঠে। একবারে প্রকৃত স্তরে পৌঁছিতে পারিলেই হইল। তৎপর কেবল তৈল উপযুক্ত পাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। তৈলের সঙ্গে কোন কোন কূপ হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উত্থিত হয়। এই গ্যাস বয়লারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকস্থলে ষ্টিম ইঞ্জিনের জন্যও এই স্বাভাবিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তাহাতে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। কূপগুলি পুরাতন হইলে অনেক সময় নিজ শক্তিতে তৈল উপরে আসিতে পারেনা, তাই পাম্প দিয়া তৈল উপরে উঠাইতে হয়। এখানে পার্ব্বত্য দেশে কূপগুলি স্থিত। প্রথমতঃ পাম্প-দ্বারা উচ্চস্থানে তৈল রাখা হয়; অথবা কূপগুলি উচ্চস্থানে স্থিত, তথা হইতে নলদ্বারা ১০।১৫ মাইল দূরস্থ পরিষ্কার করার স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রথম অবস্থায় তৈল গাঢ়, কাল ও অতি অপরিষ্কার থাকে। অপরিষ্কৃত তৈল উত্তাপদ্বারা বাষ্পে পরিণত করা হয়; সেই বাষ্প পাইপদ্বারা শীতল জলপূর্ণ বৃহৎ কাঠের বাক্সের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে বাষ্পীয়কৃত তৈল আবার জলীয় পদার্থে পরিণত হয়। ব্রহ্মদেশে অনেকগুলি কেরোসিন তৈলের কূপ আছে, কেহ তথায় গিয়া অতি সহজেই প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে পারেন। কলোম্বোতে তৈল পরিষ্কার করিবার কারখানা দেখিয়াছি, তাহার নিকট কূপ থাকিবার খুব সম্ভাবনা।

(১০) (সঞ্জীবনী, ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭)

জাপান-প্রবাসীর পত্র।

খনিবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী।

অনেকদিন আপনাদের পাঠকপাঠিকাদের নিকট উপস্থিত হই নাই। ইচ্ছা থাকাতেও নানাকারণে পত্র লিখিতে পারি নাই। বিশেষতঃ এবৎসর হাতে কলমে কাজ শিখিতে জাপানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত খনি দেখিয়া ঘুরিতে হইতেছে। পরমেশ্বরের কৃপায় এবার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছি। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক্ পৃথক্ খনি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; সেই সব স্থানে গিয়া বিশেষ ভাবে সব দেখিতে হইবে। কলেজে দুইটা খনির রিপোর্ট ও design সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া দিতে হইবে; ইহা শেষ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত; যাহা হউক সময় পাইলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আবার নানা সংবাদ লিখিতে চেষ্টা করিব।

—চীনে মাঞ্চু-প্রাধান্য—

যে চীন লইয়া সমস্ত পৃথিবী ব্যস্ত এবং যাহাতে ভারতও কম ব্যস্ত নহে, কারণ ভারত হইতে বহু সৈন্য ও ভৃত্য চীনে প্রেরিত হইয়াছে, সেই চীনদেশ সম্বন্ধে আজ দুই চারিটি কথা সংক্ষেপে লিখিতেছি। যে রাজবংশ আজ চীনে রাজত্ব করিতেছে, তাহা চীনজাতীয় নহে, মাঞ্চু-জাতীয়। প্রায় ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে মাঞ্চুরাজ চীনদেশ জয় করিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা আজকাল যে চীন বেশভূষা দেখিতে পাই, তাহা ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে চীনে ছিল না। মাঞ্চুরাজগণ চীনবাসীদিগকে মাঞ্চু পোষাক পরিতে ও লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে বাধ্য করিয়াছে। কেহ অবাধ্য হইলে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত। তাই ক্রমে ক্রমে চীনদেশে বর্ত্তমান আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ চীনবাসী পূর্ব্বের বিভিন্নতা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ সাম্রাজ্ঞীর পক্ষপাতিত্ব এখনও পূর্ণমাত্রায়

রহিয়াছে। মাঞ্চু সৈন্যই তাঁহার খুব বিশ্বস্ত; পিকিনে বহু সহস্র মাঞ্চু বাস করে। তাহারা গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী; সন্তানের জন্ম হইলেই তাহারা বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করে। সকল প্রদেশেই বিশ্বস্ত সৈন্য বাস করে। বর্ত্তমান সম্রাট বড় উদার ও সমদর্শী। তিনি চীনদেশের সামাজিক ও রাজকীয় সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে প্রায় দুই শত ছাত্র জাপানে শিক্ষার্থ আসিয়াছিল। কত উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল। নতুবা আজ কখনও চীনের এই দশা উপস্থিত হইত না।

—চীনের শাসন প্রণালী—

চীন সাম্রাজ্য আট প্রধান ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক বিভাগ একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত। প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার বেতন মাসিক ১১২৫৲ টাকা! প্রত্যেক বিভাগে এক একজন 'টার টার' সেনাপতি আছেন। এই বিভাগ আবার ক্ষুদ্র দুই ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগ একজন গভর্ণর দ্বারা শাসিত, প্রত্যেক গভর্ণরের বেতন মাসিক প্রায় ৯০০৲ টাকা। এই ক্ষুদ্র বিভাগে এক একজন কোষাধ্যক্ষ ও সেনাপতি আছেন। গভর্ণর শাসনসম্পর্কীয় ও কোষাধ্যক্ষ রাজস্ব সম্বন্ধে সব কার্য্য সম্পাদন করেন। সকলেই পিকিন গভর্ণমেণ্টের অধীন।

— সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট—

"বিদেশী ভূতদিগকে বিনাশ কর" এই বলিয়া যে বক্সারগণ ক্ষেপিয়াছিল, তাহাতে ৬৮ বৎসরবয়স্কা বৃদ্ধা সাম্রাজ্ঞী ঘৃতাহুতি না দিলে কখনই এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইত না। কুসংস্কারপূর্ণা সম্রাজ্ঞী বক্সারদের অলৌকিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করিয়াই এই বিপদে পতিত হইয়াছেন। সম্রাট বিদেশীদের সঙ্গে এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, এমন কি তিনি পিকিন হইতে পলায়ন করিতেও নারাজ ছিলেন। বাধ্য

হইয়া তাঁহাকে সব করিতে হইয়াছে। ৩০ বৎসরের যুবক সম্রাট প্রধান সংস্কারক মিঃ 'কাং'এর পরামর্শে সংস্কার কার্য্য চালাইতে পারিলে এতদিনে চীনে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতাম। সম্রাট সম্রাজ্ঞীর হাতে বন্দী হইবার পূর্ব্বে প্রিয় সংস্কারক 'কাং'কে বলিয়াছিলেন, "তুমি পলায়ন কর, তোমা হইতে দেশের প্রচুর উপকারের আশা আছে, আমার মৃত্যুতেও বড় আসে যায় না।' এই কথাতেই সম্রাটের স্বদেশপ্রেমিকতার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কাংএর পলায়ন ও সম্রাটের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিপরীত স্রোত আবার বহিতে আরম্ভ করিল; সম্রাজ্ঞীর আদেশে অনেক সংস্কারকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

—সংস্কারকের দল—

প্রাণদণ্ড দেওয়া চীন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছু নহে। এই যুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট সৈন্য কত বক্সারকে পশুর ন্যায় বধ করিয়াছে, তাহা পাঠক পাঠিকাদের অবিদিত নহে। যখন তখন হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে আমার একটী বন্ধু হাংকৌ-গভর্ণমেণ্টের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রাণ দিয়াছে। চীনে এখনও অনেক সংস্কারক রহিয়াছেন। তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নহে। আমার পরিচিত অনেক যুবক রহিয়াছেন, যাহারা লম্বা টিকি কাটিয়া ফেলিয়া ইউরোপীয় পোষাক পরিধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করেন।

হাংকৌতে সংস্কারকদের একটী গুপ্ত সমিতি ছিল, এখনও আছে; এই সমিতির উদ্দেশ্য (১) সম্রাটকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করা অর্থাৎ বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীকে পদচ্যুত করা (২) দেশের সংস্কার কার্য্য আবার আরম্ভ করা (৩) বিদেশীয়দের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উপায় বিধান করা (৪) খৃষ্টানদের প্রতিও উক্তরূপ ব্যবহার করা ইত্যাদি। টোকিওবাসী অনেক ছাত্রও এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট;

বিশেষতঃ যাঁহারা হাংকৌ হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই এই সমিতির পরিপোষক। গত গ্রীষ্মের ছুটীতে অনেকেই দেশে গিয়াছেন—(১২ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটী)। তখন রাজ-প্রতিনিধি ৩০ জন সংস্কারককে বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। তন্মধ্যে ৩ জন আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ও তাহাদের দুইজন টোকিও মিলিটারী কলেজের ছাত্র। তাহাদের মস্তক কাটিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাদের মস্তক ঝুলিতে দেখিয়া টোকিওতে আসিয়াছে। তাহারা যে কেবল লম্বা চুল কাটিয়া ভালপোষাক পরিযাই সংস্কার কার্য্য শেষ করিয়াছে তাহা নহে, প্রচুর সৎসাহস ও স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয় দিতেছে। আমি হকাইদ করলার খনি হইতে টোকিও ফিরিয়া আসার পরে এই সব সংবাদ জানিতে পারিলাম। একদা অন্য একজন চীনা বন্ধুর সহিত কথোপকথনের সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম 'ভাই, তোমার আর চীনে ফিরিয়া কাজ নাই, পড়া শেষ করিয়া আমাদের দেশে চল, তোমাকে একটা সুবিধা করিয়া দিব। আমাদের দেশে অনেক 'মিকানিকেল' ইঞ্জিনীয়ারের দরকার—(কারণ তিনি Mechanical Engineering কলেজের ছাত্র ;) কারণ তুমি দেশে ফিবিলে গভর্ণমেণ্ট তোমাকে বধ করিবে। তিনি উত্তর করিলেন "দেশের এই দুরবস্থার সময় কাপুরুষের মত নিজ সুখের জন্য অন্যত্র গিয়া কি হইবে ; মরিতে হয় দেশের জন্য মরিব"। তৎপর আমি বলিলাম "দেশে ফিরিতে হইলে বরং চুলগুলি লম্বা করিয়া যাওয়াই ভাল। তিনি বলিলেন "আর লম্বা করিলে কি হইবে? গবর্ণমেণ্ট আমাদের ফটো রাখিয়াছে ; যতদিনপর্য্যন্ত সম্রাট ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়েন, ততদিন আর চীনের আশা নাই"। সৌভা-গ্যের বিষয় তাঁহাদের খরচের টাকা সমস্তই প্রথমে জাপান গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছিল, নতুবা এখন তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত।

— চীন ও জাপান —

চীনের প্রতি জাপানের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। চীনদেশ বিভাগ করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, এমন কি যুদ্ধ করাও ইচ্ছা নহে। জাপান চীনের সাহায্য না লইয়া যুদ্ধে যোগ দিয়াছে বলিয়া "ইণ্ডিয়ান মিরার' নিন্দা করিয়াছেন এবং ভয় দেখাইয়াছেন, কবে বিদেশীয়েরা চীনদেশ ভাগ কবিয়া লইবে। ভাবিয়া দেখা উচিত, একা জাপান কি করিতে পারে? একা চীনের সাহায্য করিতে গেলে নিজেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা। সব ইউরোপীয় শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে যাইবে। অথচ চীনকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। সকল জাপানী চীনের জন্য দুঃখানুভব করে, অনেক খবরের কাগজে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখিয়াছে। চীনেরা জানে জাপানের ন্যায় তাহাদের বন্ধু আর নাই। তাই যুদ্ধের প্রারম্ভে চীন সম্রাট জাপান সম্রাটের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর কাহারই অবিদিত নহে। রাজনৈতিক জাপান দেখিল যখন কোন কিছুই করিতে পারিবনা, তখন কেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের সম্মান রক্ষা না করি। এখনও জাপান চীনের সুবিধার জন্য সব করিতে রাজি। চতুর রুশিয়া পিকিন ত্যাগের জন্য প্রস্তাব করিলে জাপান তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। তবু জাপানী সংবাদপত্রসমূহ, জাপান কেন সর্ব্বপ্রথমে এই প্রস্তাব করিলনা, সেইজন্য গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল; অবশ্য জাপান নিজ ক্ষমতা ও প্রাধান্য চীনে বিস্তার করিতে চায়; নিজ বানিজ্য চীনে বেশীরকম চালাইতে চায়।

—জাপানের বল—

ইউরোপীয়গণ যেমন নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য ভাবেনা বা ভয় করেনা, সেইরূপ জাপান এখন আর সেই স্বাধীনতা-লোপের ভয় করেনা। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজ

স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তখন আর ভয়ের কথাই নাই। এই ত্রিশ বৎসরে জাপান যে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহা দেখিয়া সব সভ্য জগৎ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। বারুদ, গুলি, বন্দুক,, কামান আর বিদেশ হইতে আসেনা; প্রতিদিন জাপানে এই সব দ্রব্য কত তৈয়ারী হইতেছে। এদেশের সকলেই যুদ্ধ করিতে জানে। বিদ্যালয় হইতে বন্দুক হস্তে ড্রিল করিতে শিখে। তৎপর উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিদিগকে একবৎসরের জন্য সৈনিককার্য্য করিতে হয়; ইহা ভিন্ন-সকলেই তিন বৎসরের জন্য সৈনিককার্য্য করিতে বাধ্য। এই অবস্থায় জাপানের আত্মরক্ষার শক্তি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। জাপানের ন্যায় রাজভক্ত দেশ বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ন্যায় জাপানীরা রাজাকে দেবতা মনে করে। এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে একাকী জাপানকে আক্রমণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন রাজশক্তি নাই। তাহাদের সৈনিক বিভাগের শিক্ষা এত উৎকৃষ্ট যে এই সম্বন্ধে আমার নিজের মত না দিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কি মত তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

The London Correspondent of the New York Tribune says :— Military men here continue to be profoundly impressed by the reports which arrive of the conduct of the Japanese in the recent operations. The general testimony of competent witnesses who saw them at Tientsin is that they were the best of all the Contingent, which formed the allied force there, and the telegraphic accounts of their proceedings on the march to Peking confirm the opinion as to their admirable qualities. They marched as

well as Russians, they were as doggedly persistent as the British and American infantry. They had the dash of the Indian cavalry and nothing to learn from the Germans in matters of organization and equipment. The American and most of the European troops suffered severely from the fatigues of the rapid march in terrible weather, which told far less on the hardy Russian peasants, and least of all on the nimble little Japanese, whose scouting work throughout was also described as excellent".

যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহা জনৈক ভদ্রলোক লণ্ডন হইতে আমেরিকা নিউ ইয়র্কের খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন ; ইহাতে জাপানের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা যদি অতিরঞ্জিত মনে করেন, তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, জাপানীরা সচরাচর খর্ব্বাকৃতি হইলেও তাহারা অন্যজাতীয় সৈন্য অপেক্ষা কম সাহসী বা কম যোদ্ধা নহে। জাপানী সৈন্য-দের এত সুন্দর শিক্ষার কারণ তাহারা একই জাতির অনুকরণ করে নাই। শিক্ষার জন্য প্রধান প্রধান সকল দেশে বহুলোক প্রেরণ করিয়া সব দেশের ভাল অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছে। সকল দেশ হইতে ভাল ২ লোক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে, জাপানের স্বাধীনতার জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না।

—জাপান ও ভারত দুর্ভিক্ষ—

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিয়া আজ বিদায় লইব। বারান্তরে 'জাপানে ভারতের দুর্ভিক্ষ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করিব।

দুর্ভিক্ষের জন্য আমরা প্রায় ২২৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রায় ৫৯৫৲ টাকা, লাহোর আর্য্য সমাজে

৩৯০৲ টাকা, পুণাতে ১৯০৲ টাকা, মহাবোধি সোসাইটিতে ১১২৲ টাকা, মান্দ্রাজে ১১২ টাকা, এলাহাবাদে ১১২ টাকা পাঠান হইয়াছে। বাকী টাকা গভর্ণমেণ্টের ফণ্ডে পাঠান হইবে। একদিন কনসার্ট দিয়াছিলাম, তাহাতেই সমস্ত খরচ বাদে ২৪৮৫৲ টাকা আয় হইয়াছিল। নিজকার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে, আবার excursion এর জন্য জুলাই মাসে টোকিও ত্যাগ করাতে অধিক টাকা ব্যয় করিতে পারি নাই। যাহা হউক আমি ত নাম মাত্র, আমাদের মত সামান্য ছাত্র কিসে এত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাই ভাবিবার বিষয়। জাপানীদের সহানুভূতি না হইলে আমরা কি করিতে পারিতাম?

—জাপানে ভারতীয় ছাত্র—

ইতিমধ্যে তিন জন নূতন ছাত্র আসিয়াছেন, পাঞ্জাব হইতে দুইজন ও বাঙ্গালী একজন। পুরাণসিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔষধ তৈয়ারী প্রণালী শিখিতেছেন, দামোদরসিং Technical School এ Electric engineering ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সাবান ও (cement) বিলাতীমাটী প্রস্তুত-প্রণালী শিখিতেছেন।

(১১) জাপান-প্রবাসীর পত্র।

৫ই নভেম্বর, মিইকে কয়লার খনি।

জাপান ও ভারত-দুর্ভিক্ষ

সংবাদপত্রে ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা পড়িতাম, নানাদেশ হইতে অর্থ টাকা আসিতেছে তাহারও সংবাদ পাইতাম। ইউনিটেরিয়ানগণ বিলাত হইতে ব্রাহ্মসমাজের নিকট টাকা পাঠাইয়াছেন এ সংবাদ যথা সময়ে পাইয়াও এখানে অর্থ সংগ্রহের কথা মনে আসে নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ব হইতেই হংকং সাংহাই ব্যাঙ্ক অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। জুন মাসের

১৪ তারিখ সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গির্জ্জায় গেলাম, তথায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতসন্তানগণের ছবি দেখিয়া মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, আমি কি ইহাদের জন্য কিছুই করিতে পারিনা? বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে রাত্রিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইতে হইবে। কেবল ছাত্রদের নিকট হইতে কয়েক পয়সা করিয়া আদায় করিতে পারিলেই অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। ভাবিলাম বিশ্ববিদ্যালয়েই ২৫০০ ছাত্র। প্রত্যেকে দশপয়সা করিয়া দিলে অনায়াসে ২৫০ ইয়েন (আমাদের ৩৭৫৲ টাকা) জমা করা যাইতে পারে; ইহা ভিন্ন টোকিওতে বহু সহস্র ছাত্র বাস করে: পরদিন প্রাতে ৮টার সময় আহারান্তে উক্ত চার্চ্চের আমেরিকান মিসনারী বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কালসার ভারত-বাসীর ছবি-বিশিষ্ট কয়েকখান আমেরিকার কাগজ লইয়া আসিলাম। তৎপর কলেজে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম, কিন্তু তখনও তিনি কলেজে আসেন নাই; আমি বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি কিনা ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে দ্বারবান্ আমার নাম তাঁহার বাড়ীতে টেলিফোন করিল। তিনি শীঘ্রই কলেজে আসিবেন এই বলিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি"

সভাপতির পদ জাপানের শিক্ষাবিভাগে অতি উচ্চ পদ; শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি। সভাপতি মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ কিকুতি অতি শিক্ষিত লোক; কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গলার; শিক্ষাবিভাগের সহকারী মন্ত্রীর কাজ হইতে এই-পদে উন্নীত হইয়াছেন। জাপানীদের ভদ্রতা দেখিলে, বিশেষতঃ বিদেশীর

প্রতি ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও পূর্ব্বোক্ত ছবিবিশিষ্ট কাগজগুলি দেখাইলাম ও বলিলাম তিনি সাহায্য করিলে আমি এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া ছাত্রদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে পারি। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন এবং আমাদের থনিকলেজের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে বলিলেন ও আবেদন পত্র জাপানী ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে সাহিত্য কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। এই হইতেই দুর্ভিক্ষের কাজ আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন এখন গ্রীষ্মের ছুটীর সময় প্রায় আসিল, তুমি বেশী আশা করিতে পারনা, সময়টা অতি খারাপ। এখানে বলা আবশ্যক যে আমি জাপানীতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারি কিন্তু তাহাদের পুস্তক পড়িতে বা লিখিতে পারি না। কারণ তাহাদের অক্ষর বহু সহস্র। প্রত্যেক শব্দের জন্য পৃথক পৃথক অক্ষর ব্যবহার করে। মর্ম্মস্পর্শী ছবি সংযুক্ত করিয়া দুই তিন দিন মধ্যে আবেদনপত্র ছাপাইয়া লইলাম। শিখ ভদ্রলোক পুরাণ সিংও আমার নামে আপীল বাহির করিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ পৃষ্ঠপোষকরূপে নাম স্বাক্ষর করিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের হেডক্লার্কের নিকট টাকা পাঠাইতে অনুরোধ করা হইল।

—দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রচার—

টোকিওস্থ প্রায় সব স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে দেখা করি। ইহা ভিন্ন একশতের উপর চিঠি মফঃস্বলস্থ স্কুলে প্রেরণ করি। আমাদের প্রেসিডেণ্ট আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন ছাত্রদের নিকট হইতে আমি বেশী আশা করিতে পারি না। সংবাদপত্রের মধ্যদিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রচার করিতে হইবে। তাই তাঁহার নিকট হইতে চিঠি

লইয়া অনেকগুলি কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সকলেই আমাদের আপীল ছাপাইতে রাজী হইলেন, কিন্তু চীন গোলমালে তাঁহারা নিতান্ত ব্যস্ত থাকায় পৃথক্ ভাবে অর্থ সংগ্রহে অনিচ্ছুক হইলেন। কেবল একখানি সংবাদপত্র অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইল। এবং আমি নূতন নূতন ছবি দিতে প্রস্তুত হইলাম। বেরন কাণ্ডারের পত্রসহ অন্য একজন সম্পাদক মিঃ শিমাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তিনি জাপানে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক। আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ধর্ম্মমত আমার সঙ্গে মিলিল। পরের দিনের কাগজে আমার বিষয় এমন সুন্দর ভাবে বাহির করিলেন যে সেইদিনই অন্য দুই কাগজের সংবাদ-দাতা একজন মহিলা ও একজন ভদ্রলোক আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত মহিলা আমাদের ছবি তাহাদের কাগজে বাহির করিলেন। চারিখান কাগজ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বাহির করিল। আমি নূতন ছবি দিয়া কুলাইতে পারিলাম না। ছবিই অনেক লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে। ছবির জন্য খৃষ্টান হেরল্ডই আমার একমাত্র সম্বল ছিল। ক্রমে জাপানের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা ব্যাপ্ত হইল। টোকিওতে প্রায় ১৫ খান দৈনিক সংবাদ পত্র আছে। জাপানের সকল সহরেই দৈনিক কাগজ আছে। খবরের কাগজ বলিলেই দৈনিক বুঝায়। ৩।৪ খানের গ্রাহকসংখ্যা লক্ষের উপর; এক খানের গ্রাহক দেড়লক্ষ। ক্ষুদ্র সহরেও দৈনিক সংবাদ পত্র আছে।

—বৌদ্ধ পুরোহিতের দয়া—

বৌদ্ধপুরোহিতগণ সর্ব্বদা ভারতের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেবল এবারে নহে, দুর্ভিক্ষের সময় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের পরিচিত দুইজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। একদিন একজন পুরোহিতের বাড়ীতে

সংবাদপত্রের সংবাদদাতার সঙ্গে যাই। এই পুরোহিতের পুত্র আমাদের সাহিত্যকলেজের ছাত্র ও অন্য একজন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন। পুরোহিত স্বয়ং ভারত ও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতেই মেয়েদের ক্ষুদ্র একটী বিদ্যালয় ছিল; তাহাতে আমাকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সেই সময়েই বলিতে বলিলেন। ভারতবাসীর দুঃখের কথা শুনিয়া অনেক মেয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। আমার বক্তৃতা শেষ হইলে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত একটি মেয়ে এসে বলিল, "মিঃ রায়! তোমার দেশের জন্য আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি"। এই কথাটুকু শেষ হইবার পূর্ব্বেই এত ক্রন্দন করিতে লাগিল যে আমি তাঁহাকে কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না, বলিলাম 'এত ভাবিবেন না, পরমেশ্বর আছেন।' সেইদিনই পুরোহিত মহাশয় আরও দুইটী সভার দিন ধার্য্য করিলেন। তারপর আমাকে আর কোন পুরোহিতের বাড়ী যাইতে হয় নাই। পুরোহিতগণ নিজ হইতেই সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বন্ধু মিঃ পুরাণসিং অনেক স্থানে যাইতে লাগিলেন, বিশেষতঃ আমাকে আরও নূতন নূতন বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হওয়াতে সমস্ত সভাসমিতির ভার শেষটায় পুরাণসিং মহাশয়ের উপর পতিত হইল। কারণ তিনি সেই সময় জাপানে নূতন আসিয়াছিলেন। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন নাই। মফঃস্বল হইতে সভার যাইতে চিঠিপত্র আসিতে লাগিল। সেই সমস্ত সভায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। সেই সময় আমাকে আবার খনি পরিদর্শনে যাইতে হইল। আমার অনুপস্থিতিতে প্রায় দুইশত মাইল দূরে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে টোকিওতে দুইজন বৌদ্ধ পুরোহিত আসিলেন। আমি হকাইদ হইতে ফিরিবার সময় তথায় যাইব বলিয়া বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং অন্য একজন মিঃ দামোদর সিংকে খবর দিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। পাঠক পাঠিকাগণ, একবার জাপানীদের আগ্রহ ও

সহানুভূতির বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন। একখান সাময়িক পত্র প্রায় ৯০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমার বোধহয় এই নয় হাজার টাকা ন্যূন পক্ষে ৬০০০০ লোক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রায় ১৪০০০৲ টাকা বৌদ্ধ পুরোহিতদের নিকট হইতে আমাদের নিকট আসিয়াছে।

বিদ্যালয়ে ভারত-দুর্ভিক্ষ।

বৌদ্ধ মন্দিরের পরেই বিদ্যামন্দির। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম, তৎপর বিদ্যা বা জ্ঞান। বিদ্যালয়গুলি হইতে মোট কত টাকা আসিয়াছে তাহা এখন নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিনা, কারণ টোকিওতে না গেলে কিছুই নিশ্চয়রূপে জানিবার সুবিধা নাই। টোকিওতে একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (কেবল আইন ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য) আছে। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসভার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৮০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বিদ্যালয়ে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন সভা হয় নাই। কিন্তু অনেক স্কুল হইতে ১০।১৫।২৫ হইতে ১০০৲।১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের জন্য কন্‌সার্ট (গীতবাদ্য)

প্রথম হইতেই একদিন কনসার্ট দিব বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। তবে ভাল রকম বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ নিজে গান বাজনায় একেবারে অনভিজ্ঞ, কিরকম কিভাবে প্রোগ্রাম করিলে লোক আকর্ষণ করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন সময় আমাদের প্রেসিডেণ্ট আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কোন কোন মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা উচিত। তাঁহারা আমাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন। তাই সভাপতির পত্র লইয়া শ্রীমতী হাতাইয়ামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলিলেন; তিনি জাপানের একজন প্রধান আইনজ্ঞ ও উন্নতিশীল দলের এক-

জন দলপতির পত্নী। এখানে বিলাতের ন্যায় রক্ষণশীল দল নাই। উদার-নৈতিক ও উন্নতিশীল—এখানে এই দুই রাজনৈতিক দল আছে; তাহাতেই বেশ বুঝা যায় যে জাপানে প্রায় সকলেই উদারতা ও উন্নতির পক্ষপাতী। তিনি কনসার্টের জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন ও তাঁহার কয়েকজন মহিলা বন্ধুদের নিকট পত্র দিলেন। সেই পত্র লইয়া আমি শ্রীমতী হামাওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তিনিও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। ইনি ভূতপূর্ব শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর পত্নী। এই দুই মহিলা ও আমাদের প্রেসিডেন্টের পত্নী কন্‌সার্টের জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এই তিন মহিলা ভিন্ন প্রসিদ্ধ ধনী মার্কুয়িস নাগেশিমার পত্নী, শিক্ষামন্ত্রী কাউণ্ট কাঁবাইয়ামার পত্নী, সম্রাটের পারিবারিক বিভাগের মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট তালবার পত্নী, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ভাইকাউন্ট আওকির পত্নী, বেরণ কাণ্ডার পত্নী প্রভৃতি গণ্যমান্য মহিলাগণ পৃষ্ঠ-পোষক হইয়াছিলেন। প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া আমার সব বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। বেরন কাণ্ডা এখানে আমাদের অভিভাবক, যখন জাপানে আসিয়াছিলাম তখন সন্ধিবন্দর ভিন্ন অন্যত্র বিশেষ অনুমতি ভিন্ন বাস করিবার নিয়ম ছিলনা; তখন বেরণ কাণ্ডা আমাদিগের জন্য অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি আমাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জামিন রহিয়াছেন, তিনি সাহিত্যকলেজের লাটিনের লেক্‌চারার ও উক্ত বানিজ্য বিদ্যালয়ের ইংলিশের অধ্যাপক, বহুদিন আমেরিকাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য দেশে কিরূপ প্রণালীতে ইংরেজী-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দেখিতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়া আমেরিকা হইয়া ইউরোপ গিয়াছেন। আগামী বৎসর ভারতে আসিবার সম্ভব।

প্রাচ্যযুবক-সমিতির নামে কন্‌সার্টের আয়োজন হইল, তাহার সম্পাদক ও সভ্যগণ কতক সাহায্য করেন। এই সমিতি চীন, কোরিয়া ভারত,

মানিলা, শ্যাম ও জাপানের ছাত্রদের দ্বারা গঠিত। অনেক গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক কন্‌সার্টে যোগদান করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যকলেজের অধ্যাপক একজন রুষ ভদ্রলোক, জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিয়ানোবাদক। একজন আমেরিকান ভদ্রলোক ও তৎপত্নী, পররদেশ-বিভাগের মন্ত্রী ভাইকাউন্ট আওকির মেয়ে, ইউরোপে শিক্ষিতা প্রসিদ্ধা কুমারী কোদা প্রভৃতি অনেকেই গানবাদ্যে যোগদান করিয়াছিলেন। টিকিটের মূল্য ৩৲ টাকা, ১॥০ টাকা। বার আনার টিকিট মাত্র ৬০ খানা বিক্রয় করিয়াছিলাম। প্রায় ৫০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া চিঠির ভিতরে কনসার্টের টিকিট পাঠান হইয়াছিল; অনেকে কন্‌সার্টে না আসিয়াও টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন; সকলে উপস্থিত হইলে বড়ই লজ্জিত হইতে হইত। প্রায় বারশত টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু হলে ৮।৯ শতের অধিক আসন ছিলনা। যাহা হউক উক্ত ভদ্রমহিলার সাহায্যে খরচ বাদে সেইদিনে প্রায় ২৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে জাপানের অনেক বড়লোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছি। উন্নতিশীল দলের নেতা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক কাউন্ট অকুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহার পত্নী ৭৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে দেখা করিবার আর এক উদ্দেশ্য ছিল; সকলশ্রেণীর লোকের—যথা বৌদ্ধপুরোহিত মিশনারী, রাজনৈতিক দলের অধিনায়ক, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, বণিকসভার সভাপতির নাম দিয়া আর একটা আবেদন পত্র ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল এবং ইহাতে অনেকেই সম্মত ছিলেন, কিন্তু আমার খনি দর্শনে না গেলেই নয়, তাই বাধ্য হইয়া এসব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। সেই অবধি টোকিওর ৭০০।৮০০ মাইল উত্তর হইতে আবার ৭৫০ মাইল দক্ষিণে এখানে আসিয়াছি। কয়েকসহস্র মাইল ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান খনিগুলি

দেখিতে হইয়াছে ; বিশেষভাবে কয়লার খনি দেখিয়াছি। সময় পাইলে খনিসম্বন্ধে বিস্তৃত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। মিইকে কয়লার খনি পূর্ব্বদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ টন কয়লা বাহির হয়। এই খনিতে নানারকমের কল ব্যবহার করা হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রায় ২৪২৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

(১২) (প্রবাসী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

"প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত

জাপান-প্রবাসীর পত্র

"প্রবাসী" নাম দেখিবামাত্র প্রবাসীদের মনে কিছু না কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইবার কথা। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও সঞ্জীবনীতে প্রবাসীর সূচনা পাঠ করিবামাত্র কিছু লিখিতে বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল। এতদিন পরে আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

বাল্যকালে কবির কবিতাপাঠে "অসভ্য জাপান" এই যে এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এখানে আসিবার পূর্ব্বে ত কোন কথাই নাই, এমন কি এখানে আসিবার পরেও এই ধারণা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান ছিল। এখন পাঠকপাঠিকাদের অনেকেই হয়ত আর জাপানকে অসভ্য বলেন না। কারণ সেই চীন-জাপানের যুদ্ধ অনেকেই ভুলেন নাই। আবার এ বৎসরের চীন উৎপাতে জাপান কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা হয়ত এখনও সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছেন। সর্ব্বশেষে সেদিন যে প্রবল পরাক্রান্ত রুশরাজ কেবল মাত্র ক্ষুদ্র জাপানের প্রতিবাদে গুপ্তসন্ধিতে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অধিকারাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় সকলের মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রথম প্রতিবাদে রুশরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন,

'রুশিয়া-চীনে সন্ধি; রুশিয়া তৃতীয় শক্তির সঙ্গে তর্ক করিতে বাধ্য নন্।' জাপান কি করিলেন? গোপনে যুদ্ধের সব আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অধিকতর দৃঢ় প্রতিবাদ রুশিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। রুশরাজ আর উপেক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। সকলেই বিদিত আছেন রুশরাজ গুপ্ত সন্ধি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা পড়িয়া হয়ত অনেকে মনে করিবেন, যে আমি পশুশক্তির পরিমাণ অনুসারে সভ্যতার তারতম্য বিচার করি. কিন্তু আমি সে দলের লোক নহি। আমি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলি, যদ্দ্বারা পৃথিবী নর-শোণিতে কলঙ্কিত হয়, চীনেই হউক, আর যেখানেই হউক, তাহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। সন্তপ্তহৃদয়ে বলিতে হয় মানবজাতি এখনও সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করে নাই। যতদিন পর্য্যন্ত এই কলঙ্কিত নরহত্যার, স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধের বিরাম না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সভ্যতা দূরে, মানবসমাজ স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে। তবুও বর্ত্তমান সভ্যতার তারতম্যের বিচাব করিবার কতক উপায় রহিয়াছে। বেশীদূরে যাইতে চাহি না, এই বর্ত্তমান চীন-উৎপাত হইতেই সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত চীনদের উপর তথাকথিত সুসভ্য জাতিদের অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া হতাশ হইয়াছেন। যাহারা আপনাদিগকে যীশুর শিষ্য বলে তাহাদের পশুভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে জগদীশের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। যুদ্ধে যে অনেক চীনবাসীকে বধ করা হইয়াছে, সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না, তাহা কেবল সাধারণ মানবজাতির সভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু শিশুহত্যা. বালক-বালিকার প্রাণহরণ, নির্দ্দোষী নিরুপায় নরনারী হত্যা কি করিয়া সমর্থন করিব? নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড, এইসব আর কি বর্ণনা করিব? বর্ণনা পাঠ করিতে শোকে ক্রোধে দেহমন জর্জ্জরিত হয়, সভ্য নামে পরিচিত, যীশু-

শিক্ষ নামধারী নরপিশাচগণ, নরপশুগণ স্ত্রীলোকের শেষ লজ্জা পর্য্যন্ত হরণ করিতে লজ্জিত হয় নাই। এই সব পাঠ করিলে কোন্ মানব অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে? এই কি সভ্যতা, এই কি ধর্ম্ম, এই কি শিক্ষা? এই সকল কার্য্যেও পশ্চিমের সুসভ্য ফ্রান্স, রুশিয়া, জার্ম্মানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার পাত্র; ইহারা পশুভাব যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কুকার্য্যে ধরণী কলুষিত করিয়াছে। এই সব কুকার্যের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় জাপান অতি উন্নত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অসভ্য প্রাচ্যজাতি সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি সমূহের আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি বলি না যে জাপানী সৈন্য কোন অত্যাচার করে নাই। কিন্তু তুলনা কর, জাপানে প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে। অনেক স্থলে জাপানী সৈন্যগণ চীনবাসীদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে।

যাহা হউক, চীনের যুদ্ধ বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কথাপ্রসঙ্গে অনেক বলিয়া ফেলিলাম। এক্ষণে সকলেরই বিশ্বাস, যে গত ৩০ বৎসরে জাপান তাহার বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান সমুদয় উন্নতি করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার পূর্ব্বে জাপানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চিন্তার বিষয় এই যে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তির সংশ্রবে থাকিয়াও কেন এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না। জাপানের যেমন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ আছে আমাদের সেইরূপ যুদ্ধ জাহাজ নাই কেন? সেই বিষয় আমি কিছু বলিতেছি না। কারণ ইংরেজরা আজ আমাদের জন্য সব করিতেছে। তবে জিজ্ঞাসা করি, সভ্যতাভিমানী ভারতবাসী! তোমাদের মধ্যে একতা নাই কেন, আজ নহে, বহুদিন পূর্ব্বে হইতেই নাই, ইহা কি সভ্যতার লক্ষণ? অসভ্য জাপানে প্রাচীনকাল হইতেই ইহা আছে, তাই জাপান স্বাধীন, তাই ক্ষুদ্র জাপান বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের ন্যায় পরাধীন নহে। মুসলমানের অধীনতা-

স্বীকারের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে ভারতের একতার অভাবই পরাধীনতার একমাত্র কারণ। তাহা আজকাল দৈনিক কার্য্যে যথেষ্ঠ দেখিতে পাই। আত্মীয়স্বজনে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, এমনকি, পিতাপুত্রে বিবাদ করিয়া, আদালতে গিয়া অপব্যয় করিয়া অনেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই কি সভ্যতা? এই কি পুরাতন আর্য্যজাতি? এই কি সেই চীন ও গ্রীক্ ভ্রমণকারীদের ভারতবাসী?

জাপানী অতিশয় শান্তি-প্রিয়। ইহাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি ইহারা তর্কস্থলেও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না। অবশ্য এখানেও আদালত আছে, মোকদ্দমা আছে, কিন্তু তথাপি বলিতেছি, জাপানীরা অতীব শান্তিপ্রিয়। বাংলার পল্লীগ্রামে যাহাদের বাড়ী তাহাদের অনেকেই হয়তঃ মেয়েদের ঝগড়া দেখিয়া থাকিবেন, সেই সিংহীগর্জ্জন এজীবনে ভুলিবার কথা নয়। পুরুষদেরত কথাই নাই। বালকদের মধ্যে ক্রীড়ার সময় যে সামান্য বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা হইতে কি তুমুল সর্ব্বদিন-ব্যাপী ঝগড়ার সূত্রপাতই না হয়। এই বিবাদের দুই পক্ষের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ভূতলে আনীত হয়। কোন্ ভদ্রলোকের সাধ্য যে সেই সুশ্রাব্য মধুর বাণী শ্রবণ করিতে পারে? কই, জাপানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু সহস্র মাইল ভ্রমণ করিলাম, প্রধানমন্ত্রী হইতে খনির সামান্য কুলীদের সঙ্গে অনেক মিলামিশি হইল, কিন্তু সেই বাল্য-স্মৃতির ঝগড়ার ন্যায় তিনবৎসর মধ্যে একটি ঝগড়াও ত আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। বুঝাবার ত কোন কথাই নাই। ভারতের বিষয় সকলেই বিদিত; আদালত হইতে সামান্য মুটে মজুরের কথা পাঠক বা পাঠিকাগণ খুব অবগত আছেন, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এখানে এ পর্য্যন্ত "বাকা" অর্থাৎ 'বোকা' ভিন্ন কাহাকেও অন্য কোন গালি দিতে শুনি নাই। এমন কি নীচ লোকের

বালকবালিকারাও 'বকো' ভিন্ন অন্য গালি দেয় না। কোন কোন সময়ে 'নিকুয়াশী' (abominable) 'ঘৃণার পাত্র' বলিয়া গালি দিতে শুনিয়াছি। ভারতের অশ্লীল গালি—যাহা ভদ্রলোকে উচ্চারণ করিতে পারে না, শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়,—তাহার সঙ্গে 'বাকাদ' ও 'নিকুয়াশী' এই দুই গালির তুলনা কর। এই কি প্রাচীন সভ্যতা, আর এই কি অসভ্য জাপান? আমার এই বর্ণনা যে স্থানে পাশ্চাত্য সভ্যতা তিলমাত্র প্রবেশ করে তথাকার পক্ষেও সত্য; ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল নহে, প্রাচীনকাল হইতেই জাপানের এই অবস্থা।

একতা অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে বিদ্যমান। তাই, জাপানীরা স্বাধীন। জাপানের ন্যায় রাজভক্ত দেশ পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। এখানকার লোকেরা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহাদের বিশ্বাস আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট 'জিম্ব' স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত জাপানীই তাঁহারই সন্তান-সন্ততি। এই আড়াই হাজার বৎসর একই রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে-এইরূপ দৃষ্টান্তও পৃথিবীর কোন ইতিহাসে পাওয়া যাইবে কি? সমুদয় জাপানী সম্রাটের পতাকার নীচে একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া আছে; তাই ইহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে ভয় করে না; তাই ক্ষুদ্র জাপানকে প্রবল পরাক্রান্ত রুশিয়াও ভয় করে। যে কোন জাতীয় উৎসবের দিনে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত জাতীয় পতাকা, সূর্য্যপতাকা উড্ডীয়মান দেখিতে পাইবে, ইহাতে কি একতা প্রকাশ পায় না? কই ভারতে এইরূপ দৃশ্য কখনও দেখি নাই। কখনও এইরূপ ছিল কি? একতা ভিন্ন উন্নতির আশা কোথায়? সুসভ্য ইংরাজের সংশ্রবে থাকিয়াও বাংলাদেশে কয়টা কোম্পানী বা বণিক-গোষ্ঠি আছে? দরিদ্র জাপানী একাকী বাণিজ্য করিতে পারে না। যেই

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিল অমনি শত শত লোক একত্র হইয়া শত শত কারবার আরম্ভ করিল। একতা তাহাদের স্বভাব, তাই গ্রামে গ্রামে কোম্পানী দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য জাতি একদিনে সভ্য হইতে পারে না; তাহাদের মধ্যে এই সব গুণ ছিল-যাহা সভ্যতাভিমানীদের মধ্যে নাই; তাই তাহারা উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করিবে। ভারতবাসী! স্বদেশের উন্নতির জন্য এক হও, দেখিবে দশবৎসরে কত কি করিতে পার। দেখ, তোমাদের কত সুবিধা। শান্তির জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না, ব্রিটীশরাজ সব করিতেছেন; ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থের জন্য এক হও, দেখ, ভারতেও উন্নতি হয় কিনা। ভারতে অর্থের অভাব নাই; ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এককোটী টাকা আদায় হইলে শিল্পশিক্ষার জন্য কয়েক কোটী আদায় হয় না? একতা নাই, তাই ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বেশী নয়, দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একশত যুবককে নানাশিল্পে নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর, দেখিবে দেশের অবস্থা ফিরে কি না। কেবল কথাতে হইবে না, কার্য্যে দেখাইতে হইবে, তবেই সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। বাঙ্গালীরা খুব বকিতে পারে। খুব লম্বা লম্বা তেজস্বী বক্তৃতা করিতে পারে। কিন্তু কার্য্যে সর্ব্ব পশ্চাতে। শিল্প-বাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা বৃথা। বেশী চাইনা, যদি দেশের ধন দেশে রাখিতে পার তবেই যথেষ্ট; যদি পশ্চিমাভিমুখী অর্থ-নদীর প্রবল স্রোত রোধ করিতে পার, কৃতার্থ মনে করিও; বাঙ্গালী পাঞ্জাবীকে পর ভাবে, বোম্বেবাসী মান্দ্রাজীকে পরদেশবাসী বলিয়া মনে করিতেছে, এই ভারতের একতা। এই অবস্থায় উন্নতি সুদূর পরাহত। স্বদেশপ্রেম নাই, লোকে সঙ্কীর্ণতায় পূর্ণ, আমার স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই জানি না। কই, ভারতে ত অনেক রকমের ধুতি তৈয়ারী হয়, কিন্তু কয়টী

বাঙ্গালী বাবু দেশী ধুতি ব্যবহার করেন? সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কয়জন শিক্ষিতলোক দেশী ধুতি ব্যবহার করেন? যদি উন্নতি চাও, স্বদেশপ্রেমিক হও, ডসনের জুতা না হইলে কি সাহেব সাজা চলে না? ভারতে কি জুতাও তৈয়ারী হয়না? বোম্বে যাও, দেখিতে পাইবে, অনেকেই দেশী ধুতি ভিন্ন বিলাতি ধুতি ব্যবহার করেন না, বাঙ্গালী! স্বার্থত্যাগ কর, প্রতিজ্ঞা কর যতদূর সম্ভব দেশীদ্রব্য পাইলে বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিব না, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের শিল্প-বানিজ্যের প্রচলন চেষ্টা কর। দেখি ত্রিশ বৎসরে ভারতের অবস্থা ফিরে কিনা। একতা চাই, একতাই সর্ব্ব উন্নতির মূল। বাংলার দুর্দ্দশা দেখ, মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার জন্য যত সভা হইয়াছে, সকলস্থানে শিল্পশিক্ষার্থে অর্থব্যয় করিবার জন্য প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইযাছে; কিন্তু বাঙ্গালার কোথাও এইরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। পাঞ্জাবে আজ যাহা কিছু হইতেছে, তাহাতেই অর্থকরী বিদ্যা সংযুক্ত হইবার চেষ্টা হইতেছে। আমি বলিনা যে সকল ছাত্রই এখানে আসিতে চেষ্টা করিবে, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও সর্ব্বশেষে ইংলণ্ড যাইতে চেষ্টা কর। আমেরিকার ভাষা ইংরাজী তাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা। যদি কোথাও যাইতে না পার, জাপানে আইস; স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপমান-বহুল কোন চাকুরী ব্যতিরেকে দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পালন করিতে পারিবে।

শ্রীরমাকান্ত রায়

"প্রবাসী" ১মবর্ষ পঞ্চম সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ বাবু রমাকান্তের এই প্রবন্ধটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

"ধনশালিতা জাতীয় উন্নতি বা মহত্বের প্রধান বা একমাত্র চিহ্ন নহে।

কিন্তু দরিদ্র জাতির উন্নতির আশা কোথায়? বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে। এইজন্য আমাদিগকে ভারতবর্ষের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে। তাহার প্রথম উপায়, ঘরের ধন ঘরে রাখা। আমাদের গত সংখ্যায় জাপানপ্রবাসী শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় লিখিয়াছেন—"শিল্পবাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা বৃথা। বেশী চাইনা, যদি দেশের ধন দেশে রাখিতে পার, তবেই যথেষ্ট; যদি পশ্চিমাভিমুখী অর্থ-নদীর প্রবলস্রোত রোধ করিতে পার, কৃতার্থ মনে করিও।" আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম হইতেই ভারত-শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের বাজারগুলি বিদেশীদ্রব্যে দখল করিয়া রাখিয়াছে, দেশী দ্রব্যদ্বারা বিদেশী-দ্রব্যকে তাড়ান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। জাপানীদের সহিত ভারত-বাসীদের কোন প্রকারে শিল্প-প্রতিযোগিতা বা ঈর্ষ্যা জন্মে নাই। তথায় থাকিয়া শিল্পশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য। এইজন্য যাঁহারা অন্যদেশে যাইতে পারেন না, তাহাদের জাপান যাওয়া কর্ত্তব্য। এই নূতন পথের প্রদর্শক শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, রমাকান্ত বাবু টোকিও খনিজ বিদ্যা-বিষয়ক কলেজে শেষ পরীক্ষায় বিশেষ খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষকগণ তাঁহার খনন (mining) এবং খনিজ অন্বেষণ বিষয়ক প্রবন্ধদ্বয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন"।*

---

*[উক্ত সংখ্যার প্রবাসীতে সম্পাদকীয় মন্তব্যের (বিবিধ প্রসঙ্গের অন্তর্গত) সঙ্গে নাড়সী ইমাই (জাপানী ফটোগ্রাফার) কর্ত্তৃক গৃহীত রমাকান্ত রায়ের একখানা ফটো (প্রতিকৃতি) প্রকাশিত হইয়াছিল।]

পরিশিষ্ট (খ)

জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্তের শ্রীহট্টে সংবর্দ্ধনা।

মিঃ রমাকান্ত রায় শ্রীহট্টে ["পরিদর্শক" পত্রিকায় প্রকাশিত]

বিগত ৩রা জানুয়ারী ১৯০৪ইং জাপান-প্রত্যাগত শ্রীহট্টবাসী শ্রীযুক্তবাবু রমাকান্ত রায় ফেচুঁগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্তবাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী ও ডাক্তার ভারতচন্দ্র দাশের নিকট টেলিগ্রাম করেন যে "অদ্য বৈকালে শ্রীহট্টে পৌঁছিব।" "Reaching Sylhet this evening" এই সংবাদ প্রায় ৫॥ ঘটিকার সময় আসে ; প্রায় অর্দ্ধেক ঘণ্টার মধ্যে তড়িত গতিতে ইহা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। অনেক সম্মানিত ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করণার্থে চান্নিঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় মিঃ রায় সহরে পদার্পণ করেন। চান্নিঘাটে অবতীর্ণ হওয়ার পরক্ষণেই ডাঃ ভারত চন্দ্র দাশ তাঁহার গলে দুইটি পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপর মিঃ রায় যথারীতি সকলকে অভিবাদন ও সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন করতঃ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টালাপ দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন : তৎপর স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে কিয়ৎকাল উপবেশন করতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাজ চন্দ্র চৌধুরীর বাসায় অবস্থিতি করেন।

পর দিবস সোমবার বৈকালে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয় : রাজা গিরিশ চন্দ্র রায় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ শর্ম্মা, বাবু সুখময় চৌধুরী, বাবু বিধু ভূষণ মজুমদার, ডাঃ সান্যাল, ডাঃ বি, শি, দাশ, বাবু নগেন্দ্র নাথ দত্ত, বাবু শশীন্দ্র মোহন সিংহ ও ডাক্তার বি, কে, নন্দী এবং বাবু রাজ চন্দ্র চৌধুরী এই কয়জন ভদ্রলোকের নামে এই সভা আহূত হইয়াছিল।

এই সভা শ্রীহট্ট জন-সাধারণের পক্ষ হইতে মিঃ রায়কে একটি অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। মিঃ রায় জাপান সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন।

তিনি বক্তৃতাস্থলে বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে জাপানের মত অনুকরণ-প্রিয় জাতি নাই। জাপান গভর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর প্রায় ১৬০ জন জাপানী ছাত্র পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সভ্য প্রদেশে শিক্ষার্থ পাঠাইয়া থাকেন। জাপান-বাসীরা আইনতঃ শিক্ষা দিতে বাধ্য। জাপানে শতকরা ৯২ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিতা। জাপানে কেহ ২১ বৎসরের পূর্ব্বে ধূমপান করিতে পারেনা। জাপানে কেহ—এমন কি জাপানপ্রবাসী চীনবাসীরাও অহিফেণ সেবন করিতে পারে না। জাপানবাসীরা ভারতবাসীদিগকে আপনার লোক মনে করে। জাপানের শিক্ষালাভ মাসিক ৫০।৬০ টাকায় হইতে পারে। জাপানবাসীরা আমাদের মত ভাত খায়। মিঃ রমাকান্ত রায় জাপান-প্রবাস কালে নিরামিষ আহার করিতেন। রমাকান্ত বাবু টেক্‌নিকেল শিক্ষার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। রমাকান্ত বাবু ভবিষ্যতে আরো ছাত্র পাঠাইবার জন্য—"আনাফণ্ড" নাম দিয়া একটি ফণ্ড স্থাপন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে যত ছাত্র এই শহরে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা প্রত্যেকে মাহিনার সঙ্গে যদি একআনা হারে চাঁদা দেন এবং স্কুলের শিক্ষকেরা তাহা সংগ্রহ করেন; তাহা হইলেই একটি প্রকাণ্ড ফণ্ড হইতে পারে; এবং এই ফণ্ডের দ্বারাই আমরা ভবিষ্যতে আরো ছাত্র জাপানে পাঠাইতে পারিব। মিঃ রায়ের এই প্রস্তাব কলিকাতা নগরীতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের এই সহরেও এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা যারপর নাই সুখী হইব। তৎপর সভাপতিকে ও মিঃ রায়কে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। সভা ভঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে বাবু রাজ চন্দ্র চৌধুরীর প্রস্তাবে মিঃ রায় ও রাজার নামে আনন্দ-ধ্বনি করা হইয়াছিল। মিঃ রায় গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও মুরারী চাঁদ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ স্কুলগুলি অবশিষ্ট ঘণ্টার জন্য ছুটি দেওয়া হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট (গ)

রমাকান্তরায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও শোক-সভার বিবরণ।

(ক) "স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় :— পরলোকগত রমাকান্তরায়ের আত্মীয় ও বন্ধুগণ আগামী ১১ই মে শুক্রবার ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা মন্দিরে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। রমাকান্ত বাবুর বন্ধু অনেক, অনেকে তাঁহার মৃতদেহের সহিত শ্মশান ঘাটে গমন করিয়াছিলেন। আমরা সকলকে জানিতে পারি নাই। সুতরাং সকলের নিকট চিঠি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। রমাকান্ত বাবু সকলের বন্ধু এই বিবেচনায় আমাদের এই ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। বিনীত, শ্রীরাধামাধব রায়, শ্রীললিত মোহন দাস।"

(সঞ্জীবনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

(খ) শোক সভা :— কলিকাতার ব্রাহ্ম মহিলাগণ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, ও হবিগঞ্জের অধিবাসীগণ রমাকান্ত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশার্থ সভা করিয়াছিলেন। আগামীকল্য প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রার্থনা সভা ও অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে শোক সভা হইবে। মিঃ এ, চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।"

(সঞ্জীবনী, ১০ই মে ১৯০৬, ২৭শে বৈশাখ ১৩১৩)

(গ) রমাকান্ত রায়ের স্মৃতি-সভা :— গত শুক্রবার কলেজ স্কোয়ারে রমাকান্ত রায়ের স্মৃতি-সভা হইয়াছিল। অনেক প্রতিপত্তিশালী লোকের স্মৃতিসভা দেখিয়াছি, কিন্তু সেদিন লক্ষপতি হইতে কড়ার ভিখারী পর্য্যন্ত, পণ্ডিত হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত যেমন শ্রদ্ধার সহিত সভার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, তেমন কখনও দেখা যায় নাই। দেশের জন্য রমাকান্ত আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন। আত্মত্যাগীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য

মুসলমান সমাজের মিঃ রসুল, মিঃ গজনবী, মিঃ আবুল কাসেম, মৌলবী দেদার বক্স, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি, খ্রীষ্টান সমাজের বাবু লাল বিহারী সাহা, হিন্দুসমাজের বাবু ভূপেন্দ্র বসু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার সতীশ চন্দ্র সিংহ, রায় পশুপতি নাথ বসু, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত, ব্যারিষ্টারদের মধ্যে মিঃ জে চৌধুরী, মিঃ বি, এম, চট্টোপাধ্যায়, মিঃ পি, কে রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রায় হাজার হাজার লোক আগমন করিয়াছিলেন। মিঃ এ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে নিম্ন-প্রকাশিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব—"আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অকৃত্রিম স্বদেশ-সেবক শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায়ের অকাল মৃত্যুতে দেশের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা স্মরণপূর্ব্বক এই সভা গভীর দুঃখ করিতেছেন।" প্রস্তাবক—কুমার মন্মথনাথ মিত্র, অনুমোদক—মিঃ জে চৌধুরী, সমর্থক— মিঃ রসুল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"রমাকান্ত রায় এতদ্দেশে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা বিস্তারের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এই সভা তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার নামে কার্য্যকারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃত্তি স্থাপনার্থ দেশবাসীগণকে আহ্বান করিতেছেন।" প্রস্তাবক—রায় পশুপতি নাথ বসু, অনুমোদক—বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—মিঃ আবুল কাসেম।

তৃতীয় প্রস্তাব—"দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক।" (প্রস্তাবক—কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, অনুমোদক—বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন)—বাবু ভূপেন্দ্র চন্দ্র বসু, বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায়, বাবু শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, মিঃ বি, এম, চট্টোপাধ্যায়, ও মিঃ পি কে রায় চৌধুরী প্রভৃতি রমাকান্ত বাবুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভাস্থলে ২২ শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

চাদা স্বাক্ষরকারীদের নাম:— শ্রীমতী ত্রিপুরাসুন্দরী চৌধুরাণী —২০০৲, বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ রায়—১০০৲, চন্দ্রকুমার রায়—১০০৲, মিঃ রাধামাধব রায়—১০০৲, বাবু রমাকান্ত রায়ের ভ্রাতৃগণ—২৫০৲, বাবু দিব্যেন্দু সুন্দর ও পূর্ণেন্দু সুন্দর বন্দোপাধ্যায়—১০০৲, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১০০৲. কৃষ্ণকুমার রায়—১০০৲, ব্রজেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী—১০০৲ মিঃ এ চৌধুরী—২০০৲, একজন বন্ধু—২০০৲, একজন বন্ধু—২০০৲, কোন ভদ্রলোক—৫০৲, একজন বন্ধু—২৫৲, একজন বন্ধু—২৫৲, একজন বন্ধু—৫০৲, মিঃ জে চৌধুরী—৫০৲. মিঃ গজনবি—১৫৲, আবুল কাসেম—১০৲, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম—৫৲, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়—৫৲. একজন বন্ধু—৫৲, মিঃ রসুল কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাস্থলে একজন ভদ্রলোক —১০৲ টাকা, অপর একজন ১৲ দান করিয়াছেন।

(সঞ্জীবনী, বৃহস্পতিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সাল, হইতে উদ্ধৃত)

(ঘ) স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের মৃত্যুতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। একটী বীজের মৃত্যুতে অসংখ্য ফলের উৎপত্তি হয়। স্বর্গীয় রমাকান্তের মৃত্যুতে যদি বহুসংখ্যক, অন্ততঃ ২।৫ জন বাঙ্গালী যুবক, তাঁহার আত্মোৎসর্গ, উৎসাহ, স্বাধীনচিন্ততা, কার্য্যশক্তি, শ্রমগৌরবানুভূতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও মরণ সার্থক হইবে। যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ যান, তাঁহারা রমাকান্তের বিদ্যা ও চরিত্র উভয়ই লইয়া গৃহে ফিরিলে সোণায় সোহাগা হয়; অভাব পক্ষে তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিলে দেশের আশা সফল হয়।”—“প্রবাসী”, আষাঢ় ১৩১৩ বাং, পৃঃ—১৭০-“বিবিধ প্রসঙ্গ”

প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১৩ বাং প্রথম ছবি—“স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়।”

পরিশিষ্ট (ঘ)

(১) জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায়ের—
মাতৃভূমিতে অভিনন্দন গীতি

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কি আনন্দ খেলেরে !

(আজি) এই শুভদিনে শুভ সমীরণে সুখের লহরী তুলেরে ॥

স্বদেশীবান্ধব পঞ্চবর্ষপরে পতিত দেশের মুখোজ্জ্বল করে

ঘরে ফিরে আজি এলরে ॥

আমাদের ভাগ্যে এহেন সুদিন, এ ক্ষুদ্র জীবনে ঘটিবে ক'দিন ?

যদি বা ঘটেছে চল সবে মিলে সুখের পাথারে ভাসিরে ॥

প্রাণের আবেগে করি সম্ভাষণ, দুঃখ জ্বালা সব হবে বিস্মরণ ।

তাঁহারি কুশল পরমেশ কাছে করযোড়ে সবে যাচিরে ॥

কি দিব হে সখে ! কি আছে মোদের,

কৃতজ্ঞতা সহ ক্ষুদ্র হৃদয়ের

জন্মভূমি-জাত এ কুসুমহার

রায় রমাকান্ত ! ধরহে

*(শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত)

(২) জলসুখার কীর্তি-সঙ্গীত ।

বাবুর ধন্য জলশুকায় ।

প্রত্যক্ষেতে প্রতাপরুদ্র চন্দ্রকুমার রায় ॥

দালান কোঠা সারি সারি নবদ্বীপের প্রায়

'হরি' বলে নৃত্য করেন সূর্য্যমণি রায় ॥
কুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ রায়।
তাঁর গুণ, যশঃ গুণ জিলায় জিলায় গায় ॥
তাঁর পুত্র বীরভদ্র বিধুভূষণ রায়।
মানব জনম সফল করে সন্ন্যাসেতে যায় ॥
(শ্রীমান্ চন্দ্র মোহন রায়ের প্রেরিত)

(৩) জলসুখার "প্রকাশ"

(১) চিরদিনতরে কাঁদাইয়ে সর্ব্বজন,
ভাসায়ে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্বজন,
করেছ চির গমন যোগীর আকার।
প্রকাশ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুখার ॥

(২) পুনঃ পুনঃ তব গুণ হয় হে স্মরণ,
একাধারে এত গুণ দেখিনা কখন।
কাঁদিছে সকলে কীর্ত্তি স্মরিয়ে তোমার।
প্রকাশ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুখার ॥

(৩) যে কেহ বিপদে পড়ি ডাকিলে তোমায়,
নিজের বিপদ ভুলি যাইতে তথায়।
ঘৃণা পিত্ত ছাড়ি মলমূত্র পরিষ্কার;
প্রকাশ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুখার ॥

(৪) কি যে যাদুমন্ত্র ছিল চরিত্রে তোমার,
একবার হেরে লোক হইত তোমার।

ভানুবিল ভানুগাছে প্রমাণ তাঁহার ;
প্রকাশ ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(৫) যেখানেতে হত যত উৎসব ব্যাপার,
সেখানেই কর্ম্মকর্ত্তা ছিলে যে তাহার ;
উপেক্ষিয়ে নিজ স্বার্থ, স্বাস্থ্য আপনার ।
প্রকাশ । প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(৬) সংকীর্ত্তনে যবে তুমি করিতে কীর্ত্তন,
কি যে ভাবে ভাবিত হে তোমার বদন !
নিরখি পাষণ্ড হৃদি গলিত আমার ।
প্রকাশ ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(৭) এত যশ, এত গুণ করিয়ে ধারণ,
নীচ বলে নিজেরে ভাবিতে অনুক্ষণ ।
এই ভাব এ নয়নে হেরিব কি আর ;
প্রকাশ ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(৮) যেই উপকার ব্রত করিলে গ্রহণ,
সেই পরোপকারে হে দিলে এ জীবন !
এমন জনম লাভ হবে কি কাহার ?
প্রকাশ ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(৯) করিয়াছ প্রাণ দিয়ে যে পুণ্য সঞ্চয়,
জগত-পিতার কোলে পাইবে আশ্রয় ।
তোমা হতে পূর্ণ হবে শান্তির ভাণ্ডার ।
প্রকাশ ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুথার ॥

(১০) এই ভিক্ষা তব স্থানে মাগিছে সাদরে,
প্রবোধ প্রফুল্ল যেন রয় তব করে,
তব মত কর্ম্মনিষ্ঠ মতিমান্ আর।
প্রকাশ! প্রকাশ তুমি ছিলে জলসুধার।*

*স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের মাতামহ ৺কৃষ্ণ গোবিন্দ রায় মহাশয়ের ভানুগাছ জমিদারী কাছারীর ম্যানেজার ৺প্রকাশ চন্দ্র দাস মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে (২৯।৯।১৩১২ বাং) ৺শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের রচিত।—(শ্রীমান্ প্রবোধ চন্দ্র দাস হইতে প্রাপ্ত)। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাস এখন আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে গোয়ালপাড়া জিলার Addl. Superintendent of Police নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৪) ভ্রাতৃ-আত্মাদের সেবা

[১৯৩৩, ২৩শে জুলাই রবিবার পূর্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত ও তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকার ১৬ই আশ্বিন, ১৮৫৫ শক, সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল।]

"এমন লোক দেখেছি, যাঁরা উঠতে বসতে খেতে শুতে সর্ব্বক্ষণ পরের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন, এবং দিন-রাত্রিই লোকহিত সাধন করেন। অবসরের সময়টুকু তাঁরা বৃথা নষ্ট না করে, কোনও না কোন উপায় আবিষ্কার করে লোকহিতে নিয়োগ করেন।

স্বর্গগত রমাকান্ত রায়, যিনি ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের আন্দোলনে প্রাণমন ঢেলে দিয়ে বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের অকৃত্রিম দেশ-সেবার পরেই বিধাতার ইচ্ছায় যাঁর অমূল্য জীবন মানব-দৃষ্টির অতীতে চলে গিয়েছিল, তিনি ঐরূপ একজন লোক ছিলেন। তাঁর লোকহিত বই-পড়া লোকহিত ছিল না। বাল্যাবধি তিনি পরার্থেই জীবন ধারণ করেছিলেন। ধনী পরিবারের ছেলে হয়েও তিনি অল্প বয়সেই গ্রামের নিতান্ত দরিদ্র লোকদের ঘরে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের অংশী হতেন; নানা কাজে স্ত্রীলোকদের সাহায্য কর্ত্তেন, এবং জাতিভেদের নিয়ম অমান্য করে, তাদের প্রদত্ত অন্নাদি আহার কর্ত্তেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে, যখন তিনি শ্রীহট্ট সহরে পড়তেন, তখন একটি সমপাঠী বন্ধুর কলেরা হলে, তিনি বাসার সকল লোকের নিষেধ না শুনে, সেই বন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২৩-২৪ বৎসর বয়সে যখন কলকাতার ছাত্রাবাসে বাস কর্চ্ছিলেন, তখন স্বচক্ষে দেখেছি, তিনি

কত প্রকারে আপন মেসের ও আপন ক্লাসের ছাত্রবন্ধুদের সাহায্য কর্ত্তেন। তাঁর প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহারে ও তাঁর আপন-ভোলা সেবায় প্রত্যেকে মনে কর্ত, তিনি তাকেই সবার চেয়ে বেশী ভালবাসেন। মেসের ঝিটির কোনও কাজে সাহায্য কর্ত্তে পার্লে, তাও তিনি হৃদয় দিয়ে কর্ত্তেন। ঝির খাওয়া হল কিনা, সকলকে আহার্য পরিবেশন করে সে নিজের জন্য ডাল-তরকারি রেখেছে কিনা, তিনি রান্না ঘরে গিয়ে নিজ হাতে ঢাকনা খুলে দেখতেন। একসঙ্গে যখন বেড়াতে যেতাম, তাঁর মন কেবল আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার দিকে থাকত না; গাড়োয়ান হোক, মুটে হোক, স্ত্রীলোক হোক কেউ কোনোও অসুবিধায় পড়েছে দেখলে, তিনি অবিলম্বে তার সাহায্যে ছুটে যেতেন! বেড়াতে বেড়াতে শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে, তিনি খুঁজতেন, কোন্ বৃদ্ধ বা কোন্ নারী ভিড় ঠেলে টিকেট কিনতে না পেরে আপনাকে বিপন্ন বোধ করছে। দেখতে পেলেই, অমনি তার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে, নিজে ভিডেব মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তেন, টিকেট কিনে এনে তার হাতে দিতেন।

সিনেট হলে পরীক্ষা আরম্ভ হবে। প্রথম দিন পরীক্ষার্থী ছেলেদের সেই বৃহৎ হলে নিজের নিজের সীট (seat) খুঁজে বার কর্ত্তে অনেক সময় যায়। সেই সময়টুকু তারা যদি পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার বইয়ের উপর একটু খানি চোখ বুলিয়ে নিতে পারে, তা হলে তো তাদের উপকার হবে; অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত্তে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটোছুটি না করে যদি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্ত্তে পায়, তাহলেও তো ভাল লিখতে পার্বে—এই চিন্তা করে রমাকান্ত রায় পরীক্ষা আরম্ভ হবার একঘণ্টা বা ততোধিক পূর্বে সিনেট হলে উপস্থিত হতেন, এবং সীট খোঁজায় ব্যস্ত অপরিচিত ছেলেদের কাছে গিয়ে নম্র ভাবে বোলতেন—"আপনার রোল নম্বর কত বলুন তো; আপনার সীট খুঁজে বার করে দিচ্ছি। আপনি ততক্ষণ বাইরে গিয়ে

একটু পড়ুন।" ছেলেরা অচেনা যুবকের এই আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখে অবাক্ হত। রমাকান্ত তাড়াতাড়ি সীট বার করে একটি একটি করে ছেলেদের ডেকে নিয়ে দেখিয়ে দিতেন, বলতেন—এই আপনার সীট। এখন নিশ্চিন্ত মনে আবার গিয়ে একটু পড়ুন; না হয় একটু বিশ্রাম করুন।

এই হল সেবার জীবন।..... ....

আজকাল হাজার হাজার যুবক বি. এ., এম. এ পাস করে বেকার বসে থাকেন; কাজকর্ম্ম পান না। এ অতি দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা রমাকান্ত রায় মহাশয়ের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা কার্য্যে তাঁদের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।"

(৫) জাপান-প্রত্যাগত রমাকান্ত রায়ের প্রতি

বিশ্বশিল্প-প্রিয়ভূমি ভারত সুদূরে
প্রশান্ত সাগরে
গিয়েছ হে প্রিয়তম, ব্যাকুলিত প্রাণে
স্বাধীন জাপানে।
নব্য সভ্য-দেশে কত সয়েছ পরাণে,
অম্লান বদনে।
খুলেছ স্বদেশী-তরে অভিনব দ্বার
সুশিল্প শিক্ষার।
বিগত দুর্ভিক্ষকালে ভারতের তরে
দূর সিন্ধু তীরে,
কেঁদেছিল প্রাণ, তাই অদম্য চেষ্টায়
ভ্রাতৃগণ দায়,
সাহায্য-সংগ্রহ অর্থ পাঠালে হেথায়
অর্দ্ধলক্ষ প্রায়।
স্বাধীন বিদেশী ছাত্র সহ পরীক্ষায়
প্রতিদ্বন্দিতায়,
উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি সু-অধ্যবসায়
গৌরব প্রভায়।
বিদেশী প্রতিভাশীল সুধিগণ হ'তে
পুলকিত চিতে,
কত সাধুবাদ তুমি লভেছ সাদরে
লজ্জানত শিরে।
বচনবাগীশ যত ভ্রাতা কৃষ্ণকায়
"বিদেশী জ্বালায়"
সাপ্তাহিকে চতুর্দ্দিকে করিছে চিৎকার
"শিল্প ছারখার।"

চেয়ে দেখ সাবধানে আজি একবার,
সে দোষ কাহার ?
শ্বেতাঙ্গবাঞ্ছিত-পদ লভি সসম্মানে
শুধু নিজ গুণে
খনিতত্ত্ব যা' করিলে তুমি আবিষ্কার
আদৃত সবার।
বিমুগ্ধ করেছ তুমি বিদেশী জাপানে
কর্ত্তব্য সাধনে।
স্ব-ইচ্ছায় কার্য্য ত্যজি নিজ জন্মস্থানে
উল্লসিত প্রাণে
ফিরে আস তাই তারা অতি সমাদরে
বিদায়ী 'ডিনারে',—
বহুমূল্য হৈমঘড়ি দিল উপহার,
ধন্য গুণাধার!
সে সুবার্ত্তা ঘোষে তাই দেশ দেশান্তরে
দূর সিন্ধুতীরে,
ভারতের উচ্চ প্রান্ত হিমাচল পাশে
শ্রীহট্ট নিবাসে
লিখিতে লেখনী নারে উল্লাসে হৃদয
ধন্য দয়াময়!
আমি আজি দিতেছি এ ক্ষুদ্র উপহার
লও এই বার।
আর যা থাকিল হবে সময়ে আবার
কৃপা বিধাতার।

(শ্রীঅনাদিচরণ তত্ত্ব-বিশারদ, কাব্য-বিনোদ,
শ্যামবাজার নিত্যানন্দ প্রদায়িনী সভা)।

(6) MR. ROMA KANTA ROY ON JAPAN
(Extracted from THE WEEKLY CHRONICLE, SYLHET, Tuesday, January 19, 1904.)

Mr. Roma Kanta Roy, whose presence in this town a few days ago excited so much public enthusiasm, has left for us a great deal to think over the low condition of our people. He gave us a glowing description of Japan—how she had been holding her own against other nations of the world in the race of material progess. He gave the reasons how Japan could assume her present position, while India, with a civilisation hoary with age, has been plunging deeper and deeper into the slough of poverty and degradation. Like India the diversity of language, prejudices of caste and the vain glory of ancient greatness have not been in the way of Japan to obstruct her path of progress. On the contrary, a meek but shrewd student of the world ever ready to adapt herself to the pressure of the environments of the new born situation, she has been sending abroad a host of her children in quest of knowledge which will bring bread and butter to her people. Like all progressive countries education is compulsory in Japan, and it is not the sort of education which produces Mr. Raleigh's discontended B.A's., but that which directs popular activities into channel that may lead to the production of wealth and its retention in the country. Such is the insatiable thirst for knowledge that grown up people already engaged in the various avocations of life attend night schools which exist in no inconsiderable numbers in Japan. We were, therefore, scarcely surprised to hear from Mr. Roy that the number of literate men and women in Japan are 95 and 92 per cent respectively of the total population, and that so many as 400 Technical Schools comprising the whole field of education in trade, arts, industries and agriculture are scattered over the country with a population of about 50 millions, while India containing a population of 300 millions does not claim even half a dozen worth the name. Thus, as Mr. Roy told us, the people of Japan command

and organise capital as if without effort and are dependent on their own resources for the every-day necessaries of life. In short, the absence of the clashing interests of a ruling nation and the patriotism and enterprise of her people above all has made Japan what she is to day; while here in India we look up to our benign rulers with folded hands and up-raised eyes and, like so many children who are never destined to reach their adolescence, run in the keen cut and circumscribed path chalked out by them. The result is that the pitiless over crowding of masses of hungry human beings has been the greatest of all problems in this down trodden land The panacea for all our ills, in the opinion of Mr. Roy, lies in the putting forth of strenuous efforts to produce trained intellig ence among our people so as to create a diversity of occupations through which the surplus population may be drawn from the agricultural pursuits and led to find the means of subsistence in manufactures or some such supports. Indications from all sides point to the conclusion as the compass points to the pole that our rulers are not in a mood to give us all we want for the amelioration of the condition of masses. We have to shift for ourselves and direct our efforts mainly to the production of indigenous intelligence for popularising modern knowledge on the diverse occupations of life. Mr. Roma Kanta Roy has suggest- ed the way, and that is to remove the high wall by which we have been shut up within the four corners of the country. What in effect he meant was that we must send troops of our youngmen abroad to learn the improved methods of arts and industries in the progressive countries of the world. He has also sug gested the means wherewith to carry out that object. Mr. Roy's proposal, is a modest and practical one. for he simply wanted us to raise a fund by a monthly contribution of not more than one anna each from students and all. What a grand consummation this might lead to, if the idea were taken up by our country men at large, and it will be a pity if all the enthu-

siasm which Mr. Roy's proposal excited here a few days ago were to get cold for want of energetic workers. Blaming Government alone and neglecting our own duty will not profit us in this country. At the same time we must tell the reader that some of the highest authorities have held that the real study of the practical sciences, such as minerology and chemical analysis, will be conferring a great benefit both on our communities and the country, for it is the students of this type, such as Mr. Roma Kanto Roy is, who must eventually turn the vast unused resources of India to account.

(7) Mr. Roma Kanto Roy's Return from Japan (Quoted from The Bengalee, Friday, October 9, 1903).

We accord a hearty welcome to Mr. Roma Kanto Roy, M.E. (Japan), on his return from the land of the crysanthemum to the shores of India. He is the first Bengalee youth who went to Japan for education and after a residence of five years in that country he has returned to India after having acquired a thorough knowledge, both practical and theoretical, of the science of engineering as applied to mines. He has been the pioneer in a path which will, we have no doubt, be trod by an increasing number of Bengalee youths in the future. For, there can be no doubt that the example and the influence of Japan is destined to play no unimportant part in moulding the character and shaping the ideals of New India. It is the privilege of all pioneers to encounter difficulties, begotten of ignorance, which are carefully avoided or successfully overcome by their more fortunate, because better-informed, successors. The letters of our Japan correspondent have already familiarised our readers with the early trials of the young Bengalee piligrim in that foreign land and also with the story of his successful career there. His professors thought so highly of his abilities that they procured for him a situation in the service of a leading Japanese firm, and for two years he was employed in one of the largest collieries

in Japan. Mr. Roy has made his own designs which have the great merit of economising both labour and capital in working mines and he had the satisfaction of seeing one of his designs carried out by his employers at an expenditure of Rs. fifteen thousand. That a Bengali youth should have commanded the confidence, to such an extent, of a Japanese firm, is indeed very much to the credit of the former. On the eve of his departure for India Mr. Roy was entertained at a farewell dinner by the staff of the firm he had served so well, at the Imperial Hotel, which is the largest hotel in Tokyo, and presented with a gold watch as a token of the esteem in which he was held by them. Indeed Mr. Roy has left such an excellent impression upon the people of Japan that henceforth Bengalee students who may go to Japan for education are sure to meet with a cordial treatment from the great and growing nation. It may be mentioned here that it was mainly by his exertions that a fund of about half a lakh of rupees was raised in Japan in aid of the sufferers from the famine in India. In welcoming Mr. Roy we may be permitted to express a hope that as a mining engineer he will find plenty of work in Bengal which is the home of the great coal industry. It new remains for us to add that Mr. Roy comes of a respectable Zaminder family of SYLHET and that one of his uncles lately returned from England after having passed the final examination at the Cooper's Hill College.*

(* Mr. Radhamadhab Roy).

ভ্রম-সংশোধন

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থমুদ্রণে অনেক বর্ণশুদ্ধি ও অন্যান্য ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহাদের কয়েকটি মাত্র সংশোধন করা হইল—

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২০	১৭৭৩	১৮৭৩
২২	১৪	অসীম	অসীমে
২৪	২৩	রমাকান্তকে	রমাকান্তকে
৩৬	৫-৬	কিছুই যখন........ প্রতি পড়িয়াছিল	হইবে কে করিবে কিছুই যখন স্থির ছিল না তখন আমাদের দৃষ্টি সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ রমাকান্তের প্রতি পড়িয়াছিল।
৬৩	৩	অতি	অতিথি
৭৬	২০	তখন	কখন

স্মৃতিপূজাগ্রন্থমালা

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয়, খণ্ড।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—"তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই স্মৃতিপূজা গ্রন্থমালা একটি নূতন ধরণের জীবনীগ্রন্থ। লেখক আসামের জনশিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর। জীবনে যে সকল মহাপুরুষ ও মনীষীর নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া ছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের জীবন ও প্রতিভার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কি তাহা লেখক এই গ্রন্থমালায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে লেখক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্র-জীবন ও রচনা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, দ্বিতীয়খণ্ডে-ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা এই পর্য্যায়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এই তিনজনের জীবন আলোচনা করিয়াছেন এবং তৃতীয়খণ্ডে অখ্যাত নরনারীর জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রতিভার বিকাশ কতখানি সম্ভব তাহা লেখকের পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। পুস্তকের মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এবং জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ এবং প্রকাশভঙ্গীটি সুন্দর। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়।"

গ্রন্থকার [পূর্ব্বনাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায়—ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর] কর্ত্তৃক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ—

বাংলা—(১) উপনিষেদের মর্ম্মবাণী (২) নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা (৩) ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা (৪) উৎসবের প্রণতি (৫) অঞ্জলি (৬) জীবনবীণার বিচিত্র সুর। "প্রবাসী", "বিশ্ববাণী" প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত।

ইংরেজী—

(1) The Bhagavad-Gita and Modern Scholarship (published by Messers Luzac & Co. London)
Some Opinions—

"It is doutbful whether a more useful and more inportant work has been done...........a better or more appropriate introduction to this great work can scarcely be conceived"—The Border Telegraph, Edinburgh.

"The author has very ably interpreted the root origin of the Gita in the light of modern thought"—The Modern Review.

"The book (the Bhagavad-Gita and Modern Scholarship) is a scholarly production ....will throw new light on the history of the origin and growth of the great Epic and the Gita and their mutual relation"—The Probuddha Bharat.

(2) Training in Leadership and Citizenship for Young India. (published by the University of Calcutta)
"A stream of educational gold runs unchecked through its three hundred pages"—the Rt Rev. G. D. Barne. D. D., Bishop of Lahore.

"The book carries a message of vital importance to India and is well worth general study.. ...the book comes at an opportune time"—The Statesman.

Sale procceds of these books, being the property of Suryamani-Lalita Sahitya Bhavan, will go to the fund of the Vaishnava Theological University, Brindaban, Mathura, U.P.

(২) ঠাকুরাম   হরিরাম

(৩) লাল চাঁদ   সাধুরাম

(৪) কালীকিশোর   মুকুন্দ   মথুরাচন্দ্র

(৫) কমলাকান্ত, রাধাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রমাকান্ত, শ্রীকান্ত   (পিতৃব্য মুকুন্দ রায়ের পোষ্যপুত্র রমাকান্ত,) সুখদা   চপলাকান্ত

৬) ক্ষিতীন্দ্র, সুধীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, সুজাতা, নৃপেন্দ্র

(খ) ৺রমাকান্ত রায়ের মাতৃবংশাবলী

(১) দুর্গারাম,

(২) মোহন লাল,

(৩) ব শবদন,

(৪) দর্পনারায়ণ (জমিদার শাখা)   (৪) জানকীবল্লভ

(৫) রাজারাম

(৬) ভাগ্যবন্ত

(৭) কন্যা   খেলারাম

(৮) দোলগোবিন্দ   গৌরকিশোর   মুলুকচান্দ   রাজকিশোর   ব্রজকিশোর   সুলোচনা   কন্যা

রাযচান্দ কন্যা ৭

(৯) কালাচান্দ   ভারতচন্দ্র   শরচ্চন্দ্র   কন্যা

(১০) কৃষ্ণকুমার কন্যা ২   কন্যা   সনৎকুমার কন্যা ৪

(১১) মহীতোষ   প্রেমতোষ   কন্যা   সুকুমার, শিশির, সুহাস, সঞ্জীব, বেনু রাণা, চম্পক, টুনু কন্যা ৪

(১২) মৃণালকান্তি কন্যা   (১২) পরিতোষ, প্রিয়তোষ, সন্তোষ,

(৯) নন্দকিশোর,   নবকিশোর   নদীয়াবাসী,   পদ্মলোচন,   কন্যা

কন্যা ৪   (১০) নবীনচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র কন্যা ১   পোষ্যপুত্র নবনারায়ণ   পার্ব্বতীচরণ কন্যা২ পুলিনবিহারী কন্যা ২

(১১) নন্দলাল কন্যা১   বিজয়কৃষ্ণ   কন্যা ৩   নবকুমার, রমেশ, গৌরহরি, গোপীচরণ নগেন্দ্র, উমেশ, কন্যা ১

(১২) গোপেন্দ্র, গোষ্ঠ, গণেশ, গোপাল কন্যা ৫   উষাকান্তি, উমাপ্রসাদ, জ্যোতির্ম্ময়

(৯) মদনমোহন, কৃষ্ণগোবিন্দ,   চন্দ্রমণি   রামচন্দ্র   সূর্য্যমণি,   কন্যা ২

(১০) কন্যা ২   বৈকুণ্ঠনাথ, অমরচান্দ, কন্যা ৫   পোষ্যপুত্র চন্দ্রকুমার   রাধারমণ রাধাবল্লভ, রাধামাধব বঙ্কুবিহারী, ব্রজবিহারী, সতীশ, সুরেশ নগেন্দ্র, কন্যা৩

(রমাকান্তের মা প্রেমমণী)

(১১) বিধুভূষণ কন্যা ১   চিত্তরঞ্জন কন্যা ২   মনমোহন, কন্যা ১, রণজিৎ, কন্যা ২   বনবিহারী কন্যা ৩   আশীষ

(১২) চিরঞ্জীব   চিন্ময়   কন্যা ৩   (১২) কন্যা

(৫) ... দ

(৬) কন্দর্প

স্মৃতিপূজাগ্রন্থমালা

প্রথমখণ্ড—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয়খণ্ড—ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা

পরমহংস রামকৃষ্ণ

তত্ত্বভূষণ সীতানাথ

ধর্ম্মগুরু শাস্ত্রী শিবনাথ

তৃতীয় খণ্ড পিতৃদেব ও মাতৃদেবী

তিনখণ্ড একত্রে বাঁধানো—মূল্য ৫৲

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ”—মূল্য ৪৲

চতুর্থ খণ্ড—স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্তরায—মূল্য ২।।০

প্রাপ্তিস্থান—

(১) চপলাবুকষ্টল, শিলং

(২) চক্রবর্ত্তী চাট্টার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

শ্রীহরিদাস নামানন্দ

স্বর্ণময়ী ললিতা সাহিত্য ভবন

ভক্তিনিকেতন

আশীষ কুটির, শিলং